শান্তিবাহিনী ও শান্তিচুক্তি

সালাম আজাদ

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

প্রথম প্রকাশ ❑ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩

প্রকাশক ❑ আসমা আরা বেগম
আফসার ব্রাদার্স ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১১৮০৩৫

অক্ষর বিন্যাস ❑ ফোর ব্রাদার্স কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
১০ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ❑ সালমানী মুদ্রণ সংস্থা ৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ❑ উত্তম সেন
স্বত্ব ❑ মির্জা ফাহ্ মিদা আজিম

মূল্য ❑ ১৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-90229-21-8

উৎসর্গ

অন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

সূচি

ক. ভূমিকা
খ. শান্তিবাহিনী ও শান্তিচুক্তি
গ. জনসংহতি সমিতির শ্রেণী বিভাগ
ঘ. পাহাড়ি জনগণের আন্দোলনের স্তর বিন্যাস
ঙ. অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান কাছ থেকে দেখা
চ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯
ছ. শান্তি চুক্তির পূর্ণ বিবরণ
জ. শান্তিবাহিনীর অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ
ঝ. এক নজরে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন

ভূমিকা

দীর্ঘ দুইদশক পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। সমগ্র দেশ থেকে এই অঞ্চলটি বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল সামরিক ও তথাকথিত বেসামরিক সরকার সমুহ। একই দেশে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছিল দ্বৈতশাসন। ০২ ডিসেম্বর'৯৭ সম্পাদিত শান্তিচুক্তি এ সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য। শান্তিচুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটেছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা দেশের এক দশমাংশ বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মনে নেমে এসেছে স্বস্তি। বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে এ চুক্তি বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া এ চুক্তি সারা বিশ্বের কাছে একটি মডেল হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য যে সব দেশে জাতিগত সমস্যা রয়েছে পাবর্ত্য শান্তিচুক্তি সে সব দেশের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে বলে আলোচিত হচ্ছে।

বিগত দু'দশক পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের উপর সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্যাতন, বিশেষ করে হত্যা, ধর্ষণ, গৃহে অগ্নিসংযোগসহ নানাভাবে মানবাধিকার লংঘনের কারণে বর্হিবিশ্বের কাছে বাংলাদেশ সমালোচিত ও নিন্দিত হয়ে আসছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের কারণে বিভিন্ন দাতাদেশ ও সংস্থা থেকে বাংলাদেশ সরকারের উপর প্রতিনিয়ত চাপ আসছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা, ভারত সরকারের সহযোগীতা এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদের আন্তরিকতা শান্তিচুক্তি সম্পাদনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে।

পাহাড়ি জনগণের স্বকীয় জাতিসত্ত্বা, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখার প্রশ্নেই প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র উইং শান্তিবাহিনী অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান-পার্বত্য চট্টগ্রামের এই তিন জেলার পাহাড়ি নাগরিকদের প্রতি ঘরে ঘরে শান্তিবাহিনীর প্রতি ছিল সহানুভূতি ও সমর্থন। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এবং শান্তিবাহিনীর মনোবল অটুট রাখতে এটা ছিল অন্যতম সহায়ক শক্তি। এরপরেও পাহাড়িদের মধ্যে গুটিকতক চিহ্নিত সুবিধাবাদী লোক সামরিক ও তথাকথিত বেসামরিক সরকারগুলির দালালী করেছে। যেমনটি করেছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার, আল সামস, আল বদর, জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি স্বাধীনতা বিরোধীচক্র। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর এই চুক্তির বিরোধীতা করে আসছে উল্লেখিত দলগুলি ছাড়াও প্রধান বিরোধী দল বি.এন.পি। সামরিক ছাউনীতে জন্মগ্রহণকারী এবং স্বাধীনতা বিরোধীচক্রের সমন্বয়ে গঠিত এই দলটি দেশের সর্বত্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের ঘোরতর বিরোধী হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা ঘোরতর বাঙালী জাতীয়তাবাদী। শান্তিচুক্তি সম্পর্কে দেশের জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো, মিথ্যাচার, লংমার্চ ইত্যাদির কথা পাঠক বিস্মৃত হয়ে না যাবারই কথা। শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বি.এন.পি'র শরীক দলগুলির কয়েকটি বক্তব্য সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। 'যে কারণে আমরা নামাজ পড়ি, সে কারণেই

শান্তিচুক্তির বিরোধীতা করতে হবে। ইসলাম এবং পার্বত্য শান্তিচুক্তি এখন মুখোমুখি।' এই বক্তব্য হাসানুজ্জামান চৌধুরী নামে জনৈক জামাতীর। জামাতের অপর দুই নেতা আব্বাস আলী খান এবং দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বক্তব্য যথাক্রমে 'চুক্তি কার্যকর হলে দেশের মানুষের ওপর লানত হবে।' এবং 'আমাদের সামনে এরচেয়ে বড় ইস্যু কবে আসবে! আসুন জেহাদে ঝাপিয়ে পড়ি। জেহাদের সময় এসেছে। আমরা জেহাদে নেমে গেলাম।' শায়খুল হাদিস মওলানা আজিজুল হক শান্তিচুক্তির বিরোধীতা করেছেন এভাবে, 'চুক্তি হয়ে গেছে বলে কান্নাকাটি করে লাভ হবে না। জেহাদে যেতে হবে। পার্বত্য চুক্তির ইস্যুতে নবী করিম (সঃ) এর সময়কার মতো যুদ্ধের সময় চলে এসেছে।'

ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তার ধুঁয়াতুলে শান্তিচুক্তির এই যে বিরোধীতা তা ঘরে বাইরে আওয়ামী লীগ সরকারকে সামাল দিতে হচ্ছে সেই সঙ্গে আঞ্চলিক পরিষদ নিয়ে জনসংহতি সমিতি (JSS) ও সরকারের মধ্যে যে মতানৈক্য চলছে তা দ্রুত সমাধান না হলে শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। শান্তিচুক্তি সম্পাদনই বড় কথা নয়। এর বাস্তবায়নই হচ্ছে প্রধান বিষয়।

শান্তিবাহিনী ও শান্তিচুক্তি ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক 'চলতিপত্র'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময় সম্পাদক শ্রী বিভুরঞ্জন সরকার আমাকে নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে প্রায় প্রতি কিস্তিতেই লেখার বিভিন্ন অংশ থেকে সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত বিষয় বাদ দিতে হয়েছে। এই গ্রন্থে তা আর নতুন করে সংযোগ করা হল না। মিস্ রোজলিন কস্তা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে তথ্য উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ডিসেম্বর ১৯৯৮

সালাম আজাদ
৩২/৬এ, পূর্ব নয়াটোলা
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

লেখকের অন্যান্য বই

❑ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু জীবন ও গবেষণা ❑ রবীন্দ্রনাথ যেভাবে লিখতেন/যেমন করে লিখতেন ❑ জগদীশচন্দ্র বসু ❑ পত্রাবলী ❑ যুদ্ধশিশু ❑ রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী ❑ আধি ❑ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ❑ দেশত্যাগ ঃ সাম্প্রতি ভাবনা ❑ রবীন্দ্রনাথের লাইটহুড প্রত্যাখানের দলিল/অন্যান্য প্রসঙ্গ ❑ মহাপুরুষ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ❑ হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে ❑ শ্বেতপত্র ❑ দেশভাগের গল্প ❑ বিশ্বকবির সোনার বাংলা ❑ পতিসরে রবীন্দ্রনাথ ❑ জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক গ্রন্থ

মানচিত্রে CHT. র থানাসমূহ

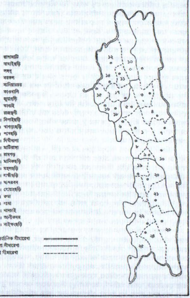

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখনো খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছেননি। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রধান এবং এই সমিতির সশস্ত্র উইং শান্তিবাহিনীর মূল নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা, যিনি এই দায়িত্ব পেয়েছেন ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপের একটি সুইসাইড স্কোয়াড তার বড় ভাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করার পর। অস্ত্র সমর্পণের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এই সন্তু লারমাও তখন স্টেডিয়ামের বাইরে। বিদেশী কূটনীতিক ও মন্ত্রিবর্গ অপেক্ষা করছেন কেউ কেউ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছেন। শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ জন সদস্য স্টেডিয়ামের দুর্বাঘাসের ওপর পেতে রাখা কাঠের ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছেন। উত্তর-দক্ষিণ দিকে লম্বা করে চার সারি চেয়ারের পেছনের এই সারিতে বসেছেন শান্তিবাহিনীর নিরস্ত্র সদস্যরা এবং সামনের দুই সারিতে বসেছেন শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সকল সদস্য। তাদের দুই পাশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা গুলিভর্তি অস্ত্র কাঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। জলপাই রঙের শার্ট ট্রাউজারে আবৃত শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সকল সদস্য নিজ নিজ বাম বুকের ওপর অস্ত্র রেখে হাতে ধরে রেখেছেন। কিন্তু দক্ষিণ দিকের প্রথম সারির একজন সদস্য নিজের অস্ত্রটি রেখেছেন বাম হাঁটুতে। এগিয়ে এলেন সামরিক বাহিনীর জনৈক সদস্য। জলপাই রঙের পোশাক পরিহিত শান্তি বাহিনীর এই টিনএজ সদস্যের রাইফেলটি হাঁটু থেকে তুলে বাম বুকের সঙ্গে সাজিয়ে দিলেন। শান্তিবাহিনীর এই সদস্যের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। অন্যান্য সঙ্গীদের থেকে একটু ভিন্নভাবে অস্ত্রটি রাখায় সে হয়তো লজ্জিত হলো।

শান্তিবাহিনীর এই তরুণ সদস্যের মুখের এই যে হাসি, এ হাসি ফুটে উঠতে সময় লেগেছে তার নিজের বয়সের চেয়েও বেশি সময়। যে অস্ত্রটি সে ব্যবহার করে আসছিল এই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সেই সেনাবাহিনী বন্ধুর মতো, অনেকটা অভিভাবকের মতো সেই অস্ত্রটি যথাস্থানে রাখার পরামর্শ দিলো এ যেনো অভূতপূর্ব। কিছুদিন আগেও যা ছিল একেবারেই অসম্ভব। এই দুই বাহিনীর পরস্পরের অস্ত্র ব্যবহার করার আদেশ ছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে। একে অন্যকে হত্যা করার কাজে। সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ যাদেরই পার্বত্য তিন জেলায় নতুন পোস্টিং হতো তাদের সর্বপ্রথম শুনিয়ে দেয়া হতো এই তিন পার্বত্য জেলা হচ্ছে অঘোষিত যুদ্ধক্ষেত্র। দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে সেভাবেই চলে আসছিল।

শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ তাদের অস্ত্র। এই অস্ত্র জমা দেয়ার আগে তাদের রাখা হয়েছিল খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের কাছাকাছি প্যারাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে। ভারতের ত্রিপুরা থেকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পথে আগত শান্তিবাহিনীর এই ৭৩৯ জন সদস্যকে অস্ত্র সমর্পণের আগের দিন এখানে এনে রাখা হয়। প্যারাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থানকালে শান্তিবাহিনীর কোনো সদস্যের মুখেই হাসি ছিল না। যদিও কর্মকর্তারা ছাড়াও পাহাড়ি নাগরিকরা, যাদের ভূখণ্ড ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে দীর্ঘ সময় ধরে তারা যুদ্ধ করেছে, সেসব আদিবাসী তরুণীরা ফুল দিয়ে তাদের বরণ করে নিয়েছে। তবুও অস্ত্র জমা দেয়ার পর তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শান্তিবাহিনীর কোনো

সদস্যই আশঙ্কামুক্ত ছিলেন না। বিগত দিনে আরো দুই বার তাদের অগ্রবর্তীরা অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেলেও সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। ওই আশঙ্কা তাদের প্রতি মুহূর্তে ভাবিয়ে তুলেছে। পাহাড়ি তরুণীরা ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়ার পরেও এজন্যই কি শান্তিবাহিনীর সদস্যদের মুখে হাসি দেখা যায়নি?

চট্টগ্রামের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল নুরুদ্দীনের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন মনীষ তালুকদার। পাহাড়িদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই তিনি শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। নিজের এবং স্ত্রী-সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে; সর্বোপরি সরকারের লোভনীয় প্রস্তাবে আকৃষ্ট হয়ে তিনি ১৯৮৫ সালে অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু 'পূর্বেকার অবস্থা দেখে এতো ভালো ফল আশা করি না। কারণ বাংলাদেশ সরকার যে কমিটমেন্ট করে তা আদৌ বাস্তবায়ন করে না। শান্তি চুক্তি, অস্ত্র সমর্পণ এটা ভালো কথা। কিন্তু তার বাস্তবায়ন নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।' বললেন মনীষ তালুকদার।

তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেও কি এ চুক্তি বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয়?

শান্তিবাহিনীর সাবেক লেফটেন্যান্ট মনীষ বললেন, চুক্তির সব শর্ত বাস্তবায়নের জন্য কমপক্ষে আট/দশ বছর লাগবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকবে মাত্র তিন বছর। যদি আগামীতে অন্য দল ক্ষমতায় আসে তাহলে এ চুক্তি কি তারা মেনে নেবে? পাহাড়ি জনগণের যে সমস্যা তার স্থায়ী কোনো সমাধান হলো না। রাজনৈতিক দলগুলো সর্বসম্মতভাবে যদি এই চুক্তি সমর্থন করতো তাহলে আমরা পাহাড়িরা আশঙ্কামুক্ত হতে পারতাম।

এ আশঙ্কা কি শুধু মনীষ তালুকদারের? শান্তিচুক্তি আওয়ামী লীগের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দীর্ঘ দুই যুগ ধরে দেশের তিনটি পার্বত্য জেলাকে সমস্ত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। এই চুক্তির ফলে তার অবসান ঘটলো। রাষ্ট্রীয় বাজেটের এক-দশমাংশ ব্যয় করা হতো এই জেলায় সেনাবাহিনীর পেছনে। তা বন্ধ হবে। প্রতিদিন যে প্রায় তিন কোটি টাকা পার্বত্য জেলা তিনটির আর্মির পেছনে ব্যয় করা হতো তা দেশের উন্নয়নে ব্যয় করা সম্ভব হবে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি নয়, প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট স্তূপ রয়েছে পার্বত্য জেলাসমূহে। তা আহরণকল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ সম্পদ সমস্ত দেশের উন্নয়নে ব্যয় করার পথ অনেকটা নির্বিঘ্ন হবে। এ পর্যন্ত যা শোনা যাচ্ছে তাতে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে পার্বত্য জেলাসমূহে। কিন্তু এই বিনিয়োগ কি উদ্দেশ্যে, কাদের মাধ্যমে হবে তা ভেবে দেখা দরকার। পাহাড়িদের সঙ্গে ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়াবলী নিয়ে যাতে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি না হয়, বিনিয়োগ করতে দেয়ার আগে সেদিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আশির দশকের মাঝামাঝি জাপান থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল পার্বত্য জেলার বৌদ্ধদের বিভিন্নভাবে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। জাপান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দাতা দেশ হলেও পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিষয়ে তাদের নীরবতা যে কারো মনে প্রশ্নের উদয় হতে পারে।

পার্বত্য জেলা তিনটিতে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় পাহাড়ি জনসংখ্যা ছিল ৯৭.৫% । ১৯৯১ সালের জনগণনার হিসাব অনুযায়ী পাহাড়ি জনসংখ্যার পরিমাণ ৫১ ভাগ। বর্তমানে এই হার যে আরো কমে গেছে তা বলা বাহুল্য। কারণ জিয়াউর রহমানের সময় থেকে শুরু করে শান্তি চুক্তি হবার পূর্ব পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিশেষ করে নোয়াখালী থেকে পার্বত্য তিন জেলায় বাঙালিদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বসতি স্থাপন বন্ধ ছিল না। মূলত সে কারণেই পাহাড়ি জনসংখ্যার হার ৫১ ভাগে নেমে এসেছে। পার্বত্য জেলা তিনটিতে দশটি আদিবাসীর বাস। এদের মধ্যে শুধু ত্রিপুরা সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী। বোম, কিয়াং, লুসাই, মুরং, পাংখো-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের। চাক, চাকমা, কুমি, মারমা– এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। আর এই বৌদ্ধ জনসংখ্যা তিন পাহাড়ি জেলা মিলে সবচেয়ে বেশি। আদিবাসীদের মধ্যে বৌদ্ধদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ।

পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম এর ছয়দিন পরে অর্থাৎ ২০ আগষ্ট পাকিস্তান ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। কেন ২০ আগষ্টের আগে ওই ছয়দিন পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতের পতাকা উড়েছিল এবং সে পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানি পতাকা উড়াতে হয়েছিল সে ইতিহাস এখন কারো অজানা নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অংশ হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৮৮১ বাতিল করা হয়। ১৯৫৬ সালে অনন্ত বিহারী খীসা এবং মৃণাল কান্তি চাকমার নেতৃত্বে 'হিল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। ভারত বিভক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা গঠিত এটাই প্রথম উল্লেখযোগ্য সংগঠন। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পাকিস্তান সরকার ৯২,৯৭৭ জনকে বাস্তুহারা করে এবং উক্ত এলাকার ৫৪% আবাদী জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য এলাকার বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে এবং এই এলাকাকে 'উপজাতি এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত করে। পাকিস্তান সরকারের এসব কর্মকাণ্ডের কারণে ১৯৬৪ সালে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাহাড়ি নাগরিক ভারতে এবং ত্রিশ হাজার বার্মায় চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৬৫ সালের ১৮ জুন এম এন লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য ছাত্র সমিতি' নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। পরের বছর অনন্ত বিহারী খীসা এবং জে বি লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি (আদিবাসী) কল্যাণ সমিতি' নামে আরো একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে রাঙ্গামাটি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এন লারমা আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে হারিয়ে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পাহাড়িদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন এবং পাহাড়িদের অসন্তোষ উত্থাপন করে তা সমাধানের দাবি জানান। বঙ্গবন্ধু মানবেন্দ্র লারমাকে বাঙালি হয়ে যাবার কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর এই প্রস্তাবে নিজেদের

ঐতিহ্য ও স্বকীয় জাতিসত্তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উপজাতীয়রা বিচলিত বোধ করেন। মানবেন্দ্র লারমা ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' গঠন করেন। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মানিকছড়ির রাজা মং প্রু নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ফিরে আসেন। অবশ্য তার আগে ২৯ জানুয়ারি চারুবিকাশ চাকমার নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু দেখা করেছিলেন। মানবেন্দ্র লারমা শেখ মুজিবের কাছে যে চার দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন তার একটিও পূরণ না করে তিনি পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যাবার কথা বলায় পাহাড়িরা মারমুখী হয়ে ওঠে। মূলত এ কারণেই সংসদ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭২ সালে দেশে প্রথম যে সংবিধান প্রণীত হয় মানবেন্দ্র লারমা তাতে সই করেননি।

মানবেন্দ্র লারমার দাবিকে একদিকে বঙ্গবন্ধু উপেক্ষা করেন; অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী রাজা ত্রিদিব রায়কে পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ত্রিদিব রায়ের মা বিনীতা রায়কে আমেরিকায় পাঠান। ত্রিদিব রায় তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমেরিকায় কর্মরত ছিলেন। কিন্তু রাজা ত্রিদিব রায় দেশে ফিরে না এসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে থাকেন।

১৯৭৩ সালে রাঙ্গামাটির এক নির্বাচনী জনসভায় চাকমা রাজার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিব পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যাবার পরামর্শ দেন। আর ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি শান্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং ওই বছরের নির্বাচনে মানবেন্দ্র লারমা আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তবে ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের পর এম এন লারমা, অনন্ত বিহারী খীসা, চারু বিকাশ চাকমা প্রমুখ বাকশালে যোগদান করেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর মানবেন্দ্র লারমা আণ্ডার গ্রাউন্ডে চলে যান। ১৯৭৬ সালের জুনে বিলাইছড়ি আর্মড পুলিশ ক্যাম্পে এবং বেতছড়িতে শান্তিবাহিনী প্রথম হামলা করে। ওই বছর জিয়াউর রহমান পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। রাজা ত্রিদিব রায়ের মা বিনীতা রায়কে এই বোর্ডের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৭ সালের ৪ জুলাই জিয়াউর রহমান গঠন করেন ট্রাইবাল কনভেনশন। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে এম এন লারমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। তবে জাসদ প্রার্থী উপেন্দ্রলাল চাকমা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অং শ্ব প্রু চৌধুরী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র উইং শান্তিবাহিনীর অন্যতম নেতা সন্তু লারমা ও চবরি মারমা সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়।

১৯৭৯ সাল থেকেই জিয়াউর রহমান পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক হারে বাঙালি পুনর্বাসন শুরু করেন। একই বছর ২২ এপ্রিল খাগড়াছড়ির কানুনগোপাড়ায় পঁচিশ জন আদিবাসীকে হত্যা এবং ৮০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। শুরু হয় নিরীহ পাহাড়িদের ওপর হত্যা আর নির্যাতন-নিপীড়ন। ১৯৮০ সালের ২৫ এপ্রিল রাঙ্গামাটির কাউখালিতে (কলামপতি) তিনশ আদিবাসীকে হত্যা করা হয় এবং ছয়শ আদিবাসীর বাড়ি পুড়িয়ে

দেয়া হয়। ১৯৮০ সালে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কিংবা শান্তিবাহিনীর হামলায় ৮৭ জন বাঙালি নিহত হয়। এক পরিসংখ্যানে তা উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু রাঙ্গামাটি জেলার একটি এলাকায়ই যেখানে তিনশ আদিবাসীকে হত্যা করা হয়েছে সেখানে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের নিহত হওয়ার সংখ্যা কতো হতে পারে? সে পরিসংখ্যান উল্লেখের আগে জিয়াউর রহমানের বাঙালি পুনর্বাসন প্রসঙ্গে আলোকপাত করা যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭৯ সালের আগেও বাঙালি বসতি ছিল-এ কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। তখন পাহাড়ি-বাঙালির সঙ্গে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। তারা ছিল পরস্পরের কাছে বন্ধুর মতো, সুপ্রতিবেশী। আর ১৯৭৯ সালের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি ছিল ২.০৫%। কিন্তু ১৯৭৯-৮১ সালে জিয়াউর রহমানের বাঙালি পুনর্বাসনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২৭.০৫%। প্রত্যেক বাঙালি সেটেলার পরিবারকে কমপক্ষে পাঁচ একর পাহাড়ি জমি অথবা চার একর মিশ্রভ জমি কিংবা ২.৫ একর ধানের জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এই জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সরকারিভাবে। এই সঙ্গে যে যেভাবে সুবিধা মনে করেছে জমি দখল করে নিয়েছে। পরবর্তী শাসকদের সময় অর্থাৎ সাত্তার, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার শাসন আমলেও বাঙালি পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। ১৯৮১ সালে অর্থাৎ যে বছর জিয়াউর রহমান মারা যান সেই বছর বান্দরবান জেলায় পাহাড়ি জনসংখ্যা ছিল ৮৯,৫০৩ এবং বাঙালি ছিল ৭২,৪৮৪ জন। কিন্তু ১৯৯১ সালে বাঙালি জনসংখ্যার পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১,২১,১৩৯ জন। খাগড়াছড়ি জেলায় ১৯৮১ সালে বাঙালি ছিল ৯২,৭১০ জন এবং ১৯৯১ সালে এই পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১,৭৫,২৯৫ জনে। রাঙ্গামাটি জেলায় ১৯৮১ সালে বাঙালি ছিল ১,০৩, ৮০৪ জন, ১৯৯১ সালে এই পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১,৭২,৩৯০ জনে।

বান্দরবানে ১৯৮১ সালে বাঙালিদের বাড়ি ছিল ১৫,০৭৪ টি, ১৯৯১ তে সেই সংখ্যা হয় ২৪,৪২৭টি। একইভাবে খাগড়াছড়িতে ১৯৮১ সালে ছিল ১৭,৮২১ টি, ১৯৯১ সালে ৩৭, ৮৮০ টি এবং রাঙ্গামাটিতে ১৯৮১ সালে ছিল ২২,৭৫০টি, ১৯৯১ সালে ৩৫,৭৩৭ টি বাঙালি বাড়ি গড়ে ওঠে। ১৯৫১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মসজিদের সংখ্যা ছিল মাত্র দশটি। কোনো মাদ্রাসা ছিল না। ১৯৮১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মসজিদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯২টি এবং মাদ্রাসা তৈরি করা হয়েছিল পঁয়ত্রিশটি।

১৯৮১ সালের ২৬,২৭ ও ২৮ জুন তবলছড়ি এবং মাটিরাঙ্গায় পাঁচ হাজার আদিবাসীকে হত্যা করা হয় এবং পাহাড়িদের এক হাজার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে আঠারো হাজার পাহাড়ি সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরায় গিয়ে জীবন রক্ষা করতে বাধ্য হয়। এ বছর সন্তু লারমা ও চবরি মারমাকে মুক্তি দেয়া হয় এবং পার্বত্য এলাকাকে উপদ্রুত এলাকা হিসেবে ঘোষণার বিল সংসদে বাতিল করা হয়। মূলত শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করার উদ্দেশ্যেই সন্তু লারমা ও চবরি মারমাকে মুক্তি দেয়া হয় এবং সংসদে বিল বাতিল ঘোষণা করা হয়। পাহাড়িদের একটি প্রতিনিধিদল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু বাস্তবে অগ্রগতি

কিছুই হয়নি। বরং ২৫ মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি পাহাড়িদের মধ্যে যে দাঙ্গা হয়,তাতে বহু লোক হতাহত হয়। অপরদিকে ১৯৮১ সালেই সেটেলার বাঙালিদের জমির সঙ্গে নগদ টাকা দেয়ার কার্যক্রম শুরু করে জিয়াউর রহমান সরকার।

জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢালাওভাবে বাঙালি পুনর্বাসনের ধারণাটি নিয়েছিলেন পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে। ১৯৬৪ সালে পরিকল্পিতভাবে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছিল পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকচক্র তাতে শুধু এ দেশের হিন্দুরাই নির্যাতিত হয়নি এ দাঙ্গার কারণে আত্মরক্ষার্থে ময়মনসিংহ অঞ্চলের শতকরা ৭৫ জন আদিবাসী নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু হালুয়াঘাট ও ঝিনাইগাতি থানায় ১২২টি ট্রাক বোঝাই করে বহিরাগতদের এনে ছেড়ে দেয়া হয়। এসব বহিরাগত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এ অঞ্চলে হাঙ্গামা ও লুটতরাজের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটায়। পাকিস্তানি শাসকদের প্রত্যক্ষ মদদে গারো এলাকার ঘরবাড়িতে তারা অগ্নিসংযোগ করে এবং গারো মেয়েদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। ফলে প্রাণভয়ে এ অঞ্চলের আদিবাসীরা মেঘালয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর শত্রু সম্পত্তি নামে যে কালাকানুন করা হয় তার ফলে গারোদের জায়গা-জমি পাইকারি হারে বহিরাগতরা দখল করে নেয়। এ কাজে বহিরাগতদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে তৎকালীন সরকার। তাছাড়া ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের অন্দোলনকে 'কমিউনিস্ট আন্দোলন' নামে আখ্যায়িত করে কঠোর সামরিক শক্তি দিয়ে শত শত আদিবাসীকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি শাসকদের এ হত্যা ও নির্যাতনের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে অনেক হাজং জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকার পরিকল্পিতভাবে হাজংদের উৎখাতের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকারের এ পরিকল্পিত নির্যাতনের ফলে প্রায় ৭০ হাজার হাজং ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং তারা এখনো সেখানে অনিশ্চিত জীবন অতিবাহিত করছে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের আদিবাসীদের ওপর পাকিস্তান সরকার যে নির্যাতন চালিয়েছিল এবং বহিরাগতদের দ্বারা আদিবাসীদের জমি ও বসতবাড়ি দখল করেছিল, তার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমানের বাঙালি পুনর্বাসন ও আদিবাসীদের জমি দখল করার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এই প্রতিরোধ গড়ে ওঠা সম্ভব এবং সহজ হয়েছিল জনসংহতি সমিতি এবং এ সমিতির সশস্ত্র উইং শান্তিবাহিনীর উপস্থিতির কারণেই। ফলে ময়মনসিংহ অঞ্চলে পাকিস্তানি শাসকরা যতো সহজে বহিরাগতদের বসতি স্থাপন করতে সফল হয়েছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামে জিয়ার তথাকথিত বাঙালি পুনর্বাসন কার্যক্রম ততোটা সহজ ছিল না। স্বকীয় জাতিসত্তা ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্নে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাহাড়িদের নেতৃত্বে যে শান্তিবাহিনীর জন্ম হয়েছিল তাদের দমন এবং নোয়াখালী, বরিশাল, ময়মনসিংহসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বহিরাগতদের পুনর্বাসন নির্বিঘ্ন করার

উদ্দেশ্যে সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনি বাংলাদেশের একটি বিচ্ছিন্ন ভূখন্ডে পরিণত করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতার সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয় সেনাবাহিনীর ওপর। একই দেশে চলতে থাকে দ্বৈত শাসন। আর জিয়াউর রহমান মুখে বলে বেড়াতেন, 'বনও থাকবে, আদিবাসিন্দা উপজাতীয়রাও থাকবে, তাদের উচ্ছেদ করা হবে না।'

দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মতোই জনসংহতি সমিতিকে বিভক্ত করার যে পরিকল্পনা জিয়া নিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নের আগেই সামরিক বাহিনীর হাতে তিনি নিহত হন। জিয়ার মৃত্যু পর তার উত্তরসুরি সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার ১৯৮২ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি তার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ানের সঙ্গে ঢাকায় একটি বৈঠক করেন। এ বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হলেও তা সমাধানের কোনো দিক নির্দেশনা প্রদান না করেই রাষ্ট্রপতি সাত্তার বৈঠক শেষ করে দেন।

জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর মধ্যে ভাঙন ধরানোর যে পরিকল্পনা জিয়া গ্রহণ করেছিলেন, এরশাদ ক্ষমতা নেয়ার পর সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে অনেকাংশে সফল হন। ১৯৮২ সালের ৯ জানুয়ারি ট্রাইবাল কনভেনশন বান্দরবানে অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় জনসংহতি সমিতির আটদিনব্যাপী দ্বিতীয় কংগ্রেস। এ অনুষ্ঠানে মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী–এই দুই ভাগে জনসংহতি সমিতি বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন থেকে শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরে সংঘাত শুরু হয়। জনসংহতি সমিতির এই বিভক্তির কারণেই ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপের হাতে সমিতির প্রাণপুরুষ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিহত হন। মানবেন্দ্র লারমা নিহত এবং সন্তুলারমার দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে একটি বিদেশী পত্রিকার সংবাদ ছিল এরকম : On November 10, 1983 Priti Kumar's armed followers stormed Manobendra's headquarters in the Panchhari area and gunned him down. Shantu Larma, who escaped the mayhem, took control of the Larma group and fought a partly successfull factional feud against the more colourful Priti Kumar.

এই মৃত্যু এবং পার্টির ভাঙন সম্পর্কে ৩১ ডিসেম্বর সন্তু লারমা একটি ছাপানো বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতিতে বলা হয়, "গত ১০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৮৩ ইংরেজী তারিখ জুম্ম জাতির জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণিত ও কলঙ্কিত কালো দিবস। এই দিনে জুম্ম জাতির কুলাঙ্গার চক্রান্তকারী, ক্ষমতালোভী ও বিভেদপন্থী গিরি (ভবতোষ দেওয়ান), প্রকাশ (প্রীতি কুমার চাকমা), দেবেন (দেব জ্যোতি চাকমা), পলাশ (ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান) চক্র এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণ চালিয়ে জুম্ম জাতির চেতনা ও জাগরণের অগ্রনায়ক, মহান দেশপ্রেমিক, নিপীড়িত জাতি ও জনগণের অগ্রনায়ক, মহান দেশ প্রেমিক, নিপীড়িত জাতি ও জনগণের একনিষ্ঠ বিপ্লবী বন্ধু, কঠোর সংগ্রামী, ত্যাগী, ক্ষমতাসীল ও দূরদর্শী মহান জাতীয় নেতা, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে তাঁর ৮ (আট) জন সহকারী

(পরিমল বিকাশ চাকমা, মনিময় দেওয়ান, কল্যাণময় খীসা, সৌমিত্র চাকমা ও অর্জুন ত্রিপুরা প্রমুখ) সহ নির্মমভাবে হত্যা করে।....... সহকর্মীদের কয়েকজনের মরদেহের ওপরও ব্রাশ ফায়ার করে মরদেহ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তাদের ঘৃণিত চরিত্র উন্মোচন করে গেছে।

.... পার্টির অভ্যন্তরে একশ্রেণীর ক্ষমতা লিপ্সু, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থান্বেষী ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃস্থানীয় কর্মী আন্দোলনের বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলাতে না পেরে এবং নিজেদের দুর্বলতা, দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহার ঢাকার উদ্দেশ্যে সর্বোপরি ক্ষমতায় উচ্চভিলাসী হয়ে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায় নিয়ে এক উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করতে থাকে। এই উপদলীয় চক্রান্তের হোতা হলো-প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ) ও দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন)। পরবর্তীতে দেশী-বিদেশী, অন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালদের খপ্পরে পড়ে এদের সঙ্গে চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়ে ভবতোষ দেওয়ান (গিরি), ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান, (পলাশ), সনৎ কুমার চাকমা (সাগর), যতীন্দ্র ত্রিপুরা (নির্মল)।

১০ জুন ১৯৮৩ বিশেষ সেক্টর কার্যালয়ে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পার্টির অধিকাংশ নেতৃত্বকে উৎখাত করার নীল নকশা প্রণয়ন করে শপথ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

শেষ পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের একটা ইউনিটের সঙ্গে আত্মগোপন অবস্থারত বিশেষ সেক্টরের সদস্যদের উস্কানিমূলক ও উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা থেকে ১৪ জুন, ১৯৮৩ এক সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে চক্রান্তকারীরা ষড়যন্ত্রের নীল নকশাসহ সকল গোপনীয় দলিল পত্রাদি ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়।.......

অবশেষে বিভেদপন্থী চতুঃচক্রীরা যখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ও কূটনৈতিক চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়লো তখন জাতীয় বেঈমানরা উদ্ভূত সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরসন করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে বাধ্য হলো। আন্দোলন তথা দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পার্টি অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে নিরসনের জন্য পার্টি ও বিভেদপন্থীদের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বৈঠকে ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া এই নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।.......

কিন্তু গোপনে গোপনে শান্তি চুক্তির অন্তরালে গিরি-প্রকাশ-দেবেন পলাশ চক্র আবার দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালদের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়ে নিজেদের হীন ও সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে অনেক জঘন্যতম ষড়যন্ত্র করে বসে। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত লংঘন করে ১০ নভেম্বর ৮৩ জাতীয় বিশ্বাসঘাতকরা, প্রতিক্রিয়াশীল বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ পলাশ চক্র অতর্কিত হামলা পরিচালনা করে জাতীয় ইতিহাসে এক কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করলো। জুম্ম জাতির জাতীয় ইতিহাসে এই ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ সবচেয়ে ঘৃণিত ও কলঙ্কিত দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলো।.......

একমাত্র পার্টি ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই এই চরম সংকট মোকাবেলা করতে সক্ষম। সম্মিলিতভাবে বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক, মীরজাফরের গোষ্ঠী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিয়ে অচিরেই গৃহযুদ্ধের অবসান করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতে হবে।"

একই ঘটনা সম্পর্কে প্রীতি গ্রুপ ২৩ জানুয়ারী ১৯৮৪ "দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে জনসংহতি সমিতি" শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে বাংলায়। একই তারিখে ইংরেজীতে প্রকাশিত আর একটি পুস্তিকায় প্রীতি গ্রুপ বিশ্ব বিবেকের কাছে জুম্ম জাতির রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানায়। উভয় পুস্তিকা ভারতীয় কাগজে ছাপানো হয়। বাংলা পুস্তিকায় প্রকাশিত দীর্ঘ বিবৃতির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য সমস্যা নিরসনকল্পে বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সন থেকে ৮ দিনব্যাপী পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিরাজমান পরিস্থিতির ওপর প্রতিনিধিগণ বিশদ আলোচনা পর্যালোচনা করে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গকে আহ্বান জানান। আলোচনা পর্যালোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে পার্টিতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা ও সর্বোপরি বাস্তব বিবর্জিত মনগড়া রাজনৈতিক তত্ত্ব বিরাজমান। এসব পার্টি থেকে দূর করে দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণের ওপর জোর আহ্বান জানানো হয়।......

লারমা চক্র তাদের ভিতশক্ত করে ফেলার উদ্দেশ্যে কাউকে প্রমোশন দিয়ে, কাউকে আর্থিক সুযোগ দিয়ে এবং আরও নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করে কর্মীদের মধ্যেকার ঐক্যে ফাটল ধরাতে সম্মেলনের পর পরই ব্যাপকভাবে তৎপরতা শুরু করে দেয়। পার্টির সাংগঠনিক কাজের অজুহাত দেখিয়ে কতিপয় তোষামোদকারী ও সুবিধাভোগী কর্মীকে ক্যাম্প্‌ও পোস্ট বি,১ নং সেক্টর ও ২ নং সেক্টরে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করে সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে। এসব প্রতিনিধিগণ পার্টির সর্বপ্রকার নিয়ম শৃঙ্খলা লংঘন করে নানা ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করে বিভিন্ন স্তরের কর্মীদেরকে লারমাচক্রে টেনে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।.....

পার্টির এহেন সংকটকালে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে শ্রীগিরি সামনাসামনি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যাবতীয় বিবাদ বিসংবাদ ও মত পার্থক্যের অবসান করে পার্টির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দেন। শ্রীলারমা লোক দেখানো ভাবে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং শ্রীগিরিকে পার্টির সদর কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। শ্রীগিরি উক্ত উদ্দেশ্যে যথাসময় ১৯৮৩ সালের জুন মাসের গোড়ার দিকে পার্টির সদর কার্যালয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়- তাঁর সঙ্গে সমস্যা সমাধানের কোন প্রকার আলোচনা বৈঠক না করে তাঁকে আটক করে রাখা হয় এবং তাঁর উপর মানসিক নির্যাতন চালানো হয়।.....

অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যাবার অজুহাত দেখিয়ে ক্যাম্প্‌ও পোস্ট 'বি' থেকে বিশেষ সেক্টর এলাকায় এক কোম্পানী জোয়ান নিয়ে আসে। জোয়ানরা বিশেষ সেক্টর

এলাকায় এসে পৌঁছলে রূপায়ণ দেওয়ান (রিপ)কে কেন্দ্রের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়। রিপ এসব জোয়ানদেরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ক্ষেপিয়ে শুরু করে দেয় অস্ত্রাগার তল্লাশির নামে ভয়াবহ সামরিক উত্তেজনা। ৪ জুন শনিবার ১৯৮৩ সন বিশেষ সেক্টরের হেফাজতে সংরক্ষিত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ চুরি করে নিয়ে যায়-হুমকি প্রদর্শন করে বিশেষ সেক্টরে অবস্থানরত কর্মীদেরকে। এসব উত্তেজনা সত্ত্বেও বিশেষ সেক্টর হেড কোয়ার্টারে অবস্থানরত কর্মীরা যথেষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন।.....

১৯৮৩ সালের ১৪ জুন মঙ্গলবার, সকাল ১১.১৫ ঘটিকায় বিশেষ সেক্টর হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করে লারমাচক্র ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষের জন্ম দিয়ে দেশ ও জাতিকে সম্পূর্ণ এক অনিশ্চিত অবস্থায় ঠেলে দেয়। এতে অগ্র গুরু অমৃতলাল চাকমা (কলি ওস্তাদ) এবং কর্পোরাল তরুণ নির্মমভাবে নিহত হন এবং ক্যাপ্টেন সরজিৎসহ অপর চারজনকে বন্দী করে নির্মমভাবে পাশবিক নির্যাতন করা হয়। এ সঙ্গে আমরা প্রয়াত লারমার ২৩-৫-৮৩ইং তারিখে সন্তুকে লেখা একটি চিঠির অংশ বিশেষ তুলে ধরলাম.....'তুমি, আমি ও মিহির আলোচনা করেছি অনেক। শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান, না অশান্তিপূর্ণভাবে সমাধান-এ দুই পথ থেকে কোন পথ বেছে নেওয়া হবে। অনেক কথাই হয়েছিল। তবে যে কথা সবচেয়ে বেশি হয়েছিল-অশান্তিপূর্ণভাবে সমাধান এবং তা করতে হলে পূর্ব সফলতা অবশ্যই প্রয়োজন।'.........

১৪জুন, মঙ্গলবার ১৯৮৩ ইংরেজী জুম্ম জাতির জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত ও বেদনাদায়ক দিবস। এই দিনে বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারী, ক্ষমতালোভী ও দুর্নীতিবাজ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (প্রবাহন), সন্তু, লারমা (তুঙ), কালিমাধন চাকমা (মিহির) ও রূপায়ন দেওয়ান (রিপ) তাদের হীন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য গোপন নীল নকশার মাধ্যমে ভ্রাতৃঘাতি গৃহযুদ্ধের জন্ম দিয়ে আজ দেশ ও জাতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।..........

এতদসত্ত্বেও জাতীয় সংহতি ও ঐক্য পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে ২৩ ও ২৮ জুলাই, ১৯৮৩ সন এবং ১ আগষ্ট, ১৯৮৩ সন তারিখে পর পর তিনবার লারমা চক্রের সঙ্গে আমরা বৈঠকে মিলিত হয়েছি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই পরিস্থিতিকে শান্ত ও স্বাভাবিক করতে পারস্পরিক সামরিক আক্রমণ ও হুমকি প্রদর্শন বন্ধ রাখতে ও পরস্পর বিরোধী প্রচারণা বন্ধ করতে তারা যেমিন রাজি হতে পারেনি তেমিন শ্রীগরিকে আটক অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠান করে পরিস্থিতিকে শান্ত ও স্বাভাবিক করতেও রাজি হয়নি।........

পরিশেষে তাদের দাম্ভিকতাকে খর্ব করার জন্য ১০ আগষ্ট, ১৯৮৩ তারিখে লারমা চক্রের অস্ত্রাগার দখল করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লারমার নিকট আমাদের পুনঃ ঐক্য স্থাপনের সদিচ্ছার কথা আবারও জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য লারমা উত্তেজিত হয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি তাঁর অনুগামী সেনাবাহিনীকে এ মর্মে নির্দেশ জারি করেন- আমার হুকুম, তোমরা যেখানে পাও বাকিদেরকে গুলী করো- হত্যা করো, সহায় সম্পত্তি যা পাও বাজেয়াপ্ত করো। তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। ফলে তার সেনাবাহিনীর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বহু গুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে।.........

শেষ পর্যন্ত ১৯৮৩ সনে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে স্বয়ং লারমার কাছ থেকে উভয় পক্ষের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের প্রস্তাব আসে। এ প্রস্তাবে যেমনি আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম তেমনি আন্তরিকভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণও করেছিলাম। বৈঠকের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার তাগিদে ১৯৮৩ ইংরেজী সনের ৪ সেপ্টেম্বর লারমা চক্রের অন্যতম কুচক্রী ও হত্যার নায়ক কালি মাধবের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধির এক বৈঠক হয়। এ ব্যাপারে সে ক্ষমতা প্রাপ্ত কিনা জানতে চাইলে সে ক্ষমতা প্রাপ্ত বলে স্বীকার করে। তারপর পরস্পর আক্রমণ ও পরস্পর বিরোধী অপপ্রচার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা কার্যকরী করার জন্য উভয় পক্ষের হেড কোয়ার্টারে বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করে লারমা চক্রের অনুগত সেনাবাহিনী আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করে দেয়। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ তারিখে পানছড়ি থানার অন্তর্গত লাম্বাছড়া নামক স্থানে মেজর সমীরণের নেতৃত্বে পরিচালিত অপর একটি দল আমাদের একটি ইউনিটের ওপর আহারের সময় অতর্কিত হামলা চালায়। এতে আমাদের পক্ষের করপোরাল বাস্তব ঘটনাস্থলে শহীদ হন। এতে লারমা চক্রের ছলনা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার বহিঃপ্রকাশ আর একবার ঘটলো।.........

তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মসূচী সম্পর্কে অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হয়ে আমাদের ওপর মরণ আঘাত হানার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পারা যায়। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদে তথা আমাদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের সেনাবাহিনী তার মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসে এবং জুম্ম জাতির বেঈমান-বিশ্বাসঘাতক-মীরজাফর চক্রের জাতিদ্রোহী ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য ১০ নভেম্বর, ১৯৮৩ তারিখে তাদের সদর কার্যালয়ে এক সামরিক অভিযান চালায়। এ অভিযানে লারমা তার কিছু সংখ্যক সহকর্মীসহ প্রাণ হারান এবং শ্রীগিরিকে শান্তি আলোচনার নামে সদর কার্যালয়ে ডেকে এনে আটক করা, ৩নং ও ৫নং সেক্টরের কর্মীদেরকে হাতিয়ার গোলাবারুদ নেয়ার নামে বিশেষ সেক্টরে নিয়ে আসা, শ্রী প্রীতি কুমার ও কতিপয় নেতৃস্থানীয় কর্মীকে আলোচনার নামে সদর কার্যালয়ে ডেকে আনা, বিশেষ সেক্টরের হেফাজতে সংরক্ষিত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ চুরি করে হস্তগত করা, আমাদের অনুগত নিকটতম সামরিক ইউনিট বিশেষ সেক্টরের সেনাবাহিনীর সদর কার্যালয় আক্রমণ করে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা এবং শ্রীগিরি, শ্রীপ্রকাশ ও কতিপয় নেতৃস্থানীয় কর্মীর প্রাণনাশ করার যাবতীয় গোপন দলিল পত্রাদিও হস্তগত করা হয়।........"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করার পর যদি সন্তু লারমা দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হতেন তাহলে জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর আন্দোলনের পরিণতি কি হতো তা বলা কঠিন। প্রীতি কুমারের দলটি ছিল শান্তিবাহিনীর মধ্যে চরম উগ্র। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৫ সালে প্রীতি গ্রুপ চট্টগ্রামের তৎকালীন জিওসির কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে শান্তিবাহিনীর আন্দোলন থেকে সরে এসে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। তবে

প্রীতিকুমার চাকমা অস্ত্র সমর্পণ করেনি। মানবেন্দ্র লারমা নিহত হওয়ার আগে ৩ অক্টোবর শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রতি জেনারেল এরশাদ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। দাতা দেশগুলোর চাপের কারণেই এরশাদ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এই ঘোষণার মধ্যে আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এরশাদের ওপর আরো বেশি করে আন্তর্জাতিক চাপ দেয়ার উদ্দেশ্যে শেল অয়েল কোম্পানির পাঁচজন বিশেষজ্ঞকে অপহরণ করে এবং বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে একমাস দশদিন পরে '৮৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তাদের মুক্তি দেয়। শেল অয়েল নামের এই আন্তর্জাতিক কোম্পানির বিশেষজ্ঞদের অপহরণ করার ফলে আন্তর্জাতিক মহলে শান্তিবাহিনীর প্রসঙ্গটি আরো ব্যাপক আলোচিত হতে থাকে এবং দাতা দেশগুলো থেকে এরশাদের ওপর চাপ অব্যাহত থাকে। এই অবস্থায় এরশাদ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উন্নয়নের জন্য ১০মে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঘোষণা প্রদান করেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষণার ঠিক ২১ দিনের মাথায় ৩১মে বরকলে একশ জনকে এবং রাঙ্গামাটির ভূষণছড়া গ্রামে আরো শতাধিক আদিবাসীকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় পাঁচ হাজার পাহাড়ি নাগরিক ভারতের ত্রিপুরায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ২৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য সুলতান মাহমুদসহ অপর তিনজনকে বান্দরবানের চামবাক রেস্ট হাউস থেকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অপহরণ করে।

১৯৮৫ সালের ১৯ এপ্রিল প্রীতি গ্রুপের সদস্যরা আত্মসমর্পণ করে। প্রীতি গ্রুপের কতোজন সদস্য আত্মসমর্পণ করেছিল তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এরশাদ ১৯৮৩ এবং ১৯৮৫ সালে যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শান্তিবাহিনীর মধ্যে ভাঙন ধরানো। চাকমা এবং নন-চাকমা ইস্যুতে সে সময় শান্তিবাহিনীকে বিভক্ত করা এরশাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য তিনি তখন ২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রীতি গ্রুপের যেসব সদস্য তখন অস্ত্র সমর্পণ করেছিল, তাদের কারো কারো সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এরশাদ সরকার পরবর্তীকালে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। ফলে আত্মসমর্পণকৃত শান্তিবাহিনীর অনেক সদস্য পুনরায় শান্তিবাহিনীতে ফিরে গেছে। ১৯৮৫ সালে শান্তিবাহিনীর পাঁচ হাজার সদস্যের অস্ত্র জমা দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। এ সম্পর্কে LIFE IS NOT OURS শীর্ষক ১৯৯১ সালে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তার ১৭ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে : The information given to the commission in the CHT suggests that the actual number os SB (শান্তিবাহিনী) surrendering was considerably less than 5000. কিন্তু ২০ এপ্রিল ১৯৮৫'র ডেটলাইনে 'Courier' লিখেছে : 233 Shanti Bahini members surrender arms.

১৯৮৫ সালে শান্তিবাহিনীর ঠিক কতোজন সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করেছিল তার সঠিক পরিসংখ্যান আজো জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি। যেমন জানা যাবে না পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর ইস্যুতে কতোজন লোক নিহত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান।

তবে বলা হয়ে থাকে পাহাড়ি, বাঙালি এবং আর্মি মিলিয়ে দীর্ঘ বাইশ বছরে কুড়ি হাজার নাগরিক নিহত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে অস্ত্রসমর্পণকৃত শান্তিবাহিনীর সঠিক পরিসংখ্যান জানা না যাবার অন্যতম কারণ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে তৎকালীন সরকার আন্তরিক ছিল না। শুধুমাত্র দাতা দেশসমূহকে দেখানোর জন্য এরশাদ সরকার এ কাজটি করেছিল এবং সেখানে ছিল একটি শুভঙ্করের ফাঁকি। যেটা এরশাদের চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত এ জন্যই এরশাদ সম্পর্কে তখন একটি কথা প্রচলিত ছিল, তিনি দিল্লিতে খাঁটি হিন্দু, মক্কায় সাচ্চা মুসলিম, ভ্যাটিকানে খাঁটি খ্রিষ্টান, মস্কোতে খাঁটি কমিউনিষ্ট এবং ওয়াশিংটনে গেলে খাঁটি পুঁজিবাদী। এরশাদের এই শুভঙ্করের ফাঁকি অচিরেই ধরা পড়ে যায়। ১৯৮৬ সালের ২৪ মে তিনি পুনরায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। তার আগে ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর শান্তিবাহিনী ও সরকারের সঙ্গে বৈঠক হয়। এ বৈঠকের ফলাফল ছিল মূলত শূন্য। এরশাদ ভারতীয় প্রতিনিধির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করার জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিডিআর সেক্টর কমান্ডারকে ত্রিপুরার উদয়পুরে পাঠান। এই ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছিল ১৬ মে ১৯৮৬। এ বছর ২৬ ডিসেম্বর শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয় এবং ১৬ এপ্রিল ১৯৮৭ চারশ পাহাড়ি দেশে প্রত্যাবর্তন করে। এরশাদ সরকার একদিকে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে মিটিং করে যাচ্ছিল, অপরদিকে শান্তিবাহিনীর মধ্যে বিভক্তির চক্রান্ত চালাচ্ছিল। তার এ কর্মকাণ্ডের কারণেই ১৯৮৭ সালের ২৪ এপ্রিল বাগানবাড়ি শরণার্থী ক্যাম্পে পাহাড়ি নেতা নিশাধর কারবারি শান্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়।

তার আগে ১৯৮৬ সালে ১০ মে পানছড়ি, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা ও খাগড়াছড়িতে ৫০০ আদিবাসীকে হত্যা করা হয় এবং দুই হাজার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে ৫০ হাজার পাহাড়ি নাগরিক ত্রিপুরায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভারতের ওপর শরণার্থীর চাপ উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসিমা রাও ১৯৮৭ সালের ১৭ আগষ্ট আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তার আগে ৫ জুন এরশাদ সরকারের আন্তরিকতার অভাবে ভারত থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন পণ্ড হয়ে যায়। ২৯ আগষ্ট বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পুনরায় আলোচনা শুরু হয় খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এবং ত্রিপুরার সুবরুম জেলা শাসকের বৈঠকের মধ্য দিয়ে। ১৮ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে এরশাদ সরকারের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর একটি মিটিং হয়। ১৯৮৮ সালের ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি এবং ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি সরকারের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর আরো দুটি বৈঠক হলেও শান্তিবাহিনী কর্তৃক ৪২ জন বাঙালি নিহত হয় এপ্রিলে।

১০ জুন দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আগরতলায় বৈঠক করেন। অবশ্য তার আগে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭ পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব) এ কে খন্দকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় পাহাড়িদের ত্রিশ দফা দাবি পর্যালোচনার জন্য। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ঈশ্বরী শুক্লর সঙ্গে বৈঠক করে রাষ্ট্রদূত ফারুক আহমেদ চৌধুরী দিল্লিতে ফিরে যাবার পর ১৯ জুন

শান্তিবাহিনীর সঙ্গে এরশাদ সরকারের আরো একটি বৈঠক হয়। এ বেঠকের পর ৯ জুলাই রাষ্ট্রদূত ফারুক আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন এবং শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে আসার আহ্বান জানান। এ ঘটনার ঠিক এক মাস পরে ৮ ও ৯ আগষ্ট দীঘিনালা এবং বাঘাইছড়িতে ৩৫ জন আদিবাসীকে হত্যা এবং ২৫০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে নিরীহ পাহাড়িদের ছয় হাজার নাগরিক ভারতের মিজোরামে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ১৭ অক্টোবর পাহাড়ি রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ঢাকায় এরশাদ সরকারের একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ শান্তিচুক্তি পাহাড়ি জনগোষ্ঠির স্বার্থের পরিপন্থী ঘোষণা দিয়ে শান্তিবাহিনী তা প্রত্যাখ্যান করে। যারা এ চুক্তি স্বাক্ষরে ভূমিকা রেখেছিল, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান শান্তিময় দেওয়ান তাদের অন্যতম। ২৭ ডিসেম্বর শান্তিময় দেওয়ানকে হত্যা করা হয়।

১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল সংসদে পাস করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে একটি মতৈক্য হয়। ১৪ মার্চ সর্বপ্রথম বঙ্গভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। ১৬ মার্চ এরশাদ সরকারের নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েন সেনাবাহিনী কর্তৃক আদিবাসী প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। ২৪ এপ্রিল তিন পার্বত্য জেলায় নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। ডব্লিউসিএইচআর-এর রিপোর্টের ভাষ্য অনুযায়ী, ৪ মে লংগদুতে ৩২ জন পাহাড়িকে হত্যা করা হয় এবং তাদের ৬৬০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে পঁচিশ হাজার পাহাড়ি ত্রিপুরায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ৩১ মে শান্তিবাহিনী নেতা সন্তু লারমার ভগ্নীপতি এবং চাকমা নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা শরণার্থী হিসেবে ত্রিপুরায় চলে যেতে বাধ্য হন। উপেন্দ্রলাল চাকমা দেশত্যাগ করায় এরশাদ সরকার একটি বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং এ ঘটনা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। ২৫ জুন পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ জুলাই শান্তিবাহিনী রাঙ্গামাটি রেডিও স্টেশন দখল করে। সেনাবাহিনী কর্তৃক খুন ও আদিবাসী কিশোরী ধর্ষণের ঘটনা এ বছর বৃদ্ধি পায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান না করেই জনরোষের প্রবল চাপে এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। প্রকৃত সত্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে এরশাদ কখনোই আন্তরিক ছিলেন না। দাতা দেশগুলোর চাপে তিনি লোক দেখানো কিছু কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন মাত্র। যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার পরেও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান করেননি। আন্তরিকতার অভাব, দলীয় স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল তার অন্যতম কারণ। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে হাজার হাজার সেটেলার বাঙালি রয়েছে তাদের একশ ভাগ মুসলমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে বাঙালির সংজ্ঞা ভিন্ন রকমের। বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সব ধর্মের নাগরিকের একটি বিশেষ পরিচয় রয়েছে– সবাই বাঙালি। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি মানুষেরা শুধু মুসলমানদের বাঙালি হিসেবে জানে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বাঙালিদের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর কাছ থেকে জিয়ার মতোই এরশাদ পেয়েছে কোটি কোটি ডলার অনুদান।

পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী তথা জনসংহতি সমিতি যে দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে ক. বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, খ. বহিরাগত বাঙালি প্রত্যাহার, গ. সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ইত্যাদি। সেই সঙ্গে তাদের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দাবি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার পর যতো নির্যাতন ও হত্যা হয়েছে তা নিরপেক্ষভাবে তদন্তের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে সংশ্লিষ্টদের আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা। জনসংহতি সমিতির এসব দাবি নিয়ে আলোচনার জন্য এবং ১৯৮৯ সালে প্রবর্তিত পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য একদল পাহাড়ি নাগরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর ঢাকায় এবং ৩০ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ জেনারেল এরশাদ প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলে দাবিতে মিছিল বের করে। চট্টগ্রামের মিছিলটি বিভাগীয় কমিশনারের কাছে সাত দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে। ৩০ ডিসেম্বর '৯০ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাঙ্গামাটিতে যে বক্তব্য রাখেন তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তার সরকারের অপারগতার কথা জানান। ১৯৯১ সালের ৯ জুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে ঢাকায় যে সভা হয় তাতে ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন অনুযায়ী যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৩ অক্টোবর শান্তিবাহিনীর প্রতি সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পরদিন শান্তিবাহিনী তা প্রত্যাখ্যান করে।

খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম দেড় বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে যেভাবে মানবাধিকার লংঘন করা হয় সে প্রসঙ্গে HILL WATCH HUMAN RIGHTS FORUM এর রিপোর্ট–A LAND OF BLOOD AND TEARS-এ বলা হয়েছে ঃ Parliamentary democracy has been restored in Bangladesh, there is still no true democracy and no fundamental change has taken place in the government's policy on the CHT. The region is still under military control. Serious human rights violations such as killings, arbitrary arrests, torture, rape, forcible dislocation, detention withouttrial, looting, religious persecution, illegal Muslim Bengali Settlers in direct collaboration with the security forces in the name of counter insurgency in the CHT.

খালেদা জিয়ার প্রথম দেড় বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে কি ঘটেছিল তার তারিখ উল্লেখ পূর্বক এখানে ঘটনাক্রম উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। তবে কলেবর বৃদ্ধি পাবে বিধায় ভিকটিমদের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করা যাচ্ছে না। ১৯৯১ সালের ২ জানুয়ারি সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য রাঙামাটি জেলার লংগদু থানার তিনটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে পাঁচজন নির্দোষ পাহাড়ি যুবককে ধরে নিয়ে যায়। আর্মি ক্যাম্পে নেয়ার পর

এই পাঁচ অসহায় পাহাড়ি যুবকের ওপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। ৯ জানুয়ারি একই থানার লক্ষ্মী চাকমা নামের এক যুবককে কাঠালী বাজার আর্মি ক্যাম্পে ধরে এনে অমানুষিক অত্যাচার করে। ১৩ জানুয়ারি খাগড়াছড়ির মহালছড়ি থানার লাবাছড়া গ্রামে একদল আর্মি অতর্কিতে হামলা চালিয়ে চারটি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ১৪ জানুয়ারি রাঙামাটির লংগদু থানার বানিয়াছড়ি মনোচাং গ্রামে একদল আধা-সামরিক বাহিনী পাহাড়িদের অসংখ্য বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং আদিবাসীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। বিডিআর-এর এই হামলায় বিভিন্ন বয়সের (২৮ থেকে ৭০ বছর) সতেরো জন পাহাড়ি নাগরিক মারাত্মক আহত হয়। সৈন্যরা মনতালা প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে অগ্নিসংযোগ করে। ১৭ জানুয়ারি রাঙামাটির সদর থানার বাঘমারা মৌজায় হামলা চালিয়ে চারজন পাহাড়িকে ধরে এনে আর্মি ক্যাম্পে তাদের ওপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালানো হয়। ২০ জানুয়ারি খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি ইউনিয়নের চ্যাংড়াছড়ি গ্রামের নিশিকুমার কারবারি আর্মির গুলিতে নিহত হওয়ার পর মানিকছড়ির জোনাল কমান্ডার হানিফ ইকবাল স্থানীয় হেডম্যান ও কারবারিদের ধরে এনে তাদের কাছ থেকে একটি কাগজে সই করাতে বাধ্য করে। সে কাগজটিতে লেখা ছিল নিশিকুমার কারবারি শান্তিবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি ক্যাপ্টেন মিজানুর রহমান রাঙ্গামাটির কিজিং আদম গ্রামের রেবতি চাকমার ওপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালায়।

২ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটির লংগদু থানার আতারকছড়া গ্রামের সুখরাম চাকমাকে জোরপূর্বক তার বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদ করার পর উক্ত স্থানে একটি নতুন আর্মি ক্যাম্প নির্মিত হয়। ২০ মার্চ একই থানার কাঠালি বড়দাম গ্রামের দুটি আদিবাসী বাড়িতে একদল সৈন্য লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করে। ২৭ মার্চ রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচরের যদুছড়া গ্রামের ১৫ জন বিভিন্ন বয়সের চাকমা নাগরিককে স্থানীয় জোনাল হেড কোয়ার্টারে ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। ৩১ মার্চ উক্ত থানার শিলাসদছড়ি গ্রামে একদল সৈন্য গভীর রাতে হামলা করে পাঁচটি চাকমা পরিবারের বাড়ি লুট করে এবং এসব বাড়ির সদস্যদের মারধোর করে। জেলার করলাছড়িতে একদল সৈন্য অভিযান চালিয়ে ১৩ জন নিরীহ পাহাড়ি নাগরিককে ধরে এনে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এপ্রিলের ৪ তারিখে উল্লেখিত ঘটনাটি ছাড়াও ৭,৯,১৯, ২০, ২৭ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামে শতাধিক নিরীহ পাহাড়ি নাগরিক নির্যাতিত হয়। মে মাসের ৫, ১০, ২১, ৩০, ৩১ তারিখে নির্যাতিত, আহত ও নিহত পাহাড়িদের সংখ্যা শতাধিক। এছাড়াও এ মাসের ২৯ তারিখে রাঙ্গামাটির একটি বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা করে এবং মন্দিরের মংকে (সেবায়েত) মারধোর করা হয়। জুলাই মাসের ৩, ৪, ৭, ৮, ৯, ২৭, ৩০ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রামের শতাদিক আদিবাসী নির্যাতিত এবং অর্ধশত বাড়ি ভস্মীভূত হয়। আগষ্টের ১০, ১২, ১৫, তারিখেও পাহাড়িদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। সেপ্টেম্বরের ৬, ১০, ১৩, ১৭, ২২, ২৪, ও ২৮ তারিখে নির্যাতন ছাড়াও ১৭ সেপ্টেম্বর বিড়ামুখী চাকমা নামক জনৈক আদিবাসী মহিলা চারজন পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিত হয়। বিড়ামুখী চাকমার পিতার নাম পদ্মমনি চাকমা, তার বাড়ি খাগড়াছড়ি সদর থানার পেরাছড়ি গ্রামে। অক্টোবরের ১, ৩, ৪, ৬,

১২, ১৪, ১৫, ২১, ২৪ ও ৩১ তারিখে শতাধিক পাহাড়ি নাগরিক নির্যাতিত হওয়া ছাড়াও ২৪ অক্টোবর কিয়াংগেট আর্মি ক্যাম্পের একদল সেনা পার্বত্য অঞ্চলের একটি বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা করে। তারা সমস্ত বৌদ্ধ মন্দিরটি লণ্ডভণ্ড করে এবং মন্দিরের ডোনেশন বক্স ভেঙে টাকাসহ মন্দিরের অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়। এই হামলায় বৌদ্ধ মন্দিরের সেবায়েতসহ মোট ৪৬ জন ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নাগরিক আহত হন। 'পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ' ২.২.৯২ তারিখে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে।

নভেম্বরের ৯, ১২, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ২২ ও ২৪ তাখে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন বয়সের প্রায় একশ পাহাড়ি নাগরিক হতাহত হয়। ডিসেম্বরের ৩, ১০, ১২, ১৩, ২২, ২৩, ২৯, ও ৩০ তারিখে একইভাবে অসংখ্য আদিবাসী নির্যাতিত ও হতাহত হয়। বতু মারমা, দয়ামালা চাকমা, রবি ভূষণ চাকমার স্ত্রীসহ অসংখ্য আদিবাসী মেয়ে ও গৃহবধূ ধর্ষিত হয়। পাহাড়িদের ওপর এসব নির্যাতনে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় অনেক বহিরাগত বাঙালি যুবক অংশ নেয়। জানুয়ারি ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮ ও ৩১ এবং ফেব্রুয়ারির ২, ৩, ৪, ৫, ১০, ১২, ১৮, ২২ ও ২৪ তারিখে একই ভাবে পাহাড়ি ছাত্র যুবক বৃদ্ধদের ওপর নির্যাতন চালানো হয় এবং পাহাড়ি মেয়েদের ওপর পাশবিক নির্যাতন করা হয়। মার্চের ১৬ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল থানার সাবলং গ্রামের ধর্মদেব চাকমার দুই মেয়ে অলিখা চাকমা (এসএস সি পরীক্ষার্থী) এবং অঞ্জনা চাকমা (দশম শ্রেণীর ছাত্রী) বাড়ি ফেরার পথে সেনাবাহিনীর চার সদস্য কর্তৃক ধর্ষিত হয়।

খালেদা জিয়ার শাসন আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড চালানো হয় তা লোগাং হত্যাযজ্ঞ নামে ঘৃণিত হয়ে আছে। ১০ এপ্রিল খাগড়াছড়ির পানছড়ি থানার লোগাং শান্তিগ্রামে ৩০০ (মতান্তরে ১২০০) আদিবাসীকে কেটে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এ এলাকার যেসব আদিবাসী এ হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে গিয়েছিল তারা সবাই ভারতে পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিল। কতোজন আদিবাসী লোগাং থেকে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও এটা প্রমাণিত সত্য যে উক্ত এলাকায় এ হত্যাযজ্ঞের পর একজন পাহাড়ি নাগরিকেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। লোগাং হত্যাযজ্ঞের ঘটনা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে। পক্ষান্তরে যেদিন এ হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় সেদিনই কমপক্ষে পঁচিশটি বহিরাগত বাঙালি পরিবারকে সে এলাকায় পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। ১১ এপ্রিল ঢাকা থেকে একদল বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, আইনজীবী, 'বিজু উৎসব'-এ আমন্ত্রিত হয়ে খাগড়াছড়িতে পৌছার পর লোগাং হত্যাযজ্ঞের বিস্তারিত খবর জানতে পেরে তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শনের উদ্যোগ নেন; কিন্তু পানছড়ি ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা মেজর রেজা তাদেরকে বাধা দেন। পরেরদিন খাগড়াছড়ি শহরে লোগাং হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে শোক মিছিল বের হয়। বিচারপতি সুলতান হোসেন খানের নেতৃত্বে এ হত্যাকাণ্ড তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তথ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'LOGANG DISTURBANCES INEQUIRY COMMISSION-1992' রিপোর্টের ১৬

পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে Now as regard the persons who are responsible for the incident, I have alluded above that the Banglees, ansars and Member of B.D.P. were responsible for the incident.' এই তদন্ত রিপোর্টের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং নিরপেক্ষ মানবাধিকার সংস্থাগুলো এ রিপোর্ট প্রত্যাখান করে। ২৭ এপ্রিল শেখ হাসিনা লোগাং পরিদর্শন করেন। ২৩–২৫ এপ্রিল প্যারিস কনসোর্টিয়ামে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি প্রসঙ্গ নিয়ে দাতাদেশগুলো প্রশ্ন তোলে। প্যারিস কনসোর্টিয়ামে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গটি উত্থাপনের পর খালেদা জিয়া সরকার তার সমর্থক কিছু তথাকথিত মানবাধিকার কর্মীকে আর্মি হেলিকপ্টারে নিয়মিত পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে। এসব তথাকথিত মানবাধিকার কর্মী বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে ভিত্তিহীন অসত্য তথ্য দাতা দেশগুলোর কাছে পাঠায়; কিন্তু তাদের এই অসত্য ভিত্তিহীন তথ্য ঢাকা পড়ে যায় প্রকৃত সত্যের আড়ালে। ফলে মে মাসে খালেদা জিয়া ভারত সফরে গিয়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও'র সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ এবং ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের বিষয়ে কথা বলতে বাধ্য হন। তিনি আরো বাধ্য হন তার সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি গঠন করতে। যদিও তিনটি পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার পরিষদ এই কমিটি গঠনে বিরোধিতা করে। ১০ আগষ্ট শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতি প্রথমবারের মতো অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে। জনসংহতি সমিতির এই অস্ত্রবিরতি ঘোষণা ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২৫ বার বর্ধিত করা হয়।

১৩ অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকায় সেনাবাহিনী কার্ফু জারি করে। তার আগে ৩১ মে কদমমুখী চাকমা (৩১), স্বামী বৌদ্ধ চাকমা, গুরিমিলা চাকমা (২৬), স্বামী চিত্তরঞ্জন চাকমা, যত্নমুখী চাকমা (২৮), স্বামী মঙ্গলমোহন চাকমা, সোনালীকা চাকমা (১৬), পিতা অর্জুনমনি চাকমা, নিরুপতি চাকমা (১৭), পিতা মোংগালা চাকমা, ধনবালা চাকমা (১৫), পিতা জয়ন্তী বিলাস চাকমা এবং মনখুলী চাকমা (১৪), পিতা বৌদ্ধ চাকমা–এই সাতজন পাহাড়ি গৃহবধূ ও তরুণী গণধর্ষণের শিকার হয়। এদের সকলের বাড়ি রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়াছড়ির ভাজনাপাড়া গ্রামে। তাছাড়া ১৫ এবং ২৯ জুন যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে অনুরূপ অত্যাচার চালায় খালেদা জিয়ার সেনাবাহিনী। ২৯ জুন শান্তিবাহিনীর হাতে ৪০ ইষ্ট বেঙ্গলের দুজন সেনা সদস্য নিহত হলে লে. কর্নেল ওয়াহের নেতৃত্বে ৩০ জন সেনা সদস্য রাঙ্গামাটির ফিরিঙ্গিপাড়া ও সানকোলাপাড়া গ্রামে হামলা করে। এ ধরনের আরো বহু ঘটনার বিবরণ দেয়া যেতে পারে।

১৩ অক্টোবর সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ ক'টি অঞ্চলে কার্ফু জারি করলেও খালেদা জিয়া সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাদের সঙ্গে ৫ নভেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে জনসংহতি সমিতির এক বৈঠক হয়। অলি আহমদ সরকারের পক্ষে এবং সন্তু লারমা জনসংহতি সমিতির পক্ষে এ বৈঠকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ বৈঠকের মাত্র বারোদিন পর ১৭ নভেম্বর রাঙ্গামাটির নানিয়ারচরে ৯০ জন আদিবাসীকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড

তদন্তের জন্য সরকার আরো একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। সরকার ও জনসংহতি সমিতির সঙ্গে দ্বিতীয় বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ যে, বিগত সরকার সমূহের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী যে নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে তার দায় দায়িত্ব সঙ্গত কারণেই সে সব সরকারের উপর বর্তায়। ক্ষমতাসীন সরকারের নির্দেশেই সেনাবাহিনী এ সব করেছে। এসব সরকার নিজেদের স্বার্থে দেশের সেনা বাহিনীকে নগ্নভাবে ব্যবহার করেছে।

১৯৯৩ সালের ২২ মে সরকারি কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির তৃতীয় বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ জুলাই সরকারি কমিটি ত্রিপুরা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন শেষে ১৪ জুলাই খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর পঞ্চম বৈঠক শেষে ১৯ সেপ্টেম্বর উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির একটি প্রতিনিধি দল শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করে। ১৭ নভেম্বর নানিয়ারচরে ৩০ জন আদিবাসী নিহত এবং ১৬০ জন আহত হয়। ২৪ নভেম্বর ষষ্ঠ বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হবার পর ১৯৯৪ সালের ১৫–২২ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা থেকে ১,৮৪১ জনের প্রথম শরণার্থী দলটি বাংলাদেশে ফিরে আসে। ৫ মে সপ্তম বৈঠক একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে যে সাব কমিটি গঠন করা হয় জনসংহতি সমিতির সঙ্গে তাদের ৪ জুন দুদুকছড়িতে এবং ১ জুলাই শরণার্থী কল্যাণ কমিটির সঙ্গে আরো একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১০ জুলাই সাব কমিটির সঙ্গে আরো একটি বৈঠক দুদুকছড়িতে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরা থেকে ৩,৩৪৫ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে। ২৮ আগষ্ট সাব কমিটির সঙ্গে বৈঠক হবার পর ২৬ ডিসেম্বর আরো একটি বৈঠক হয়। এ বৈঠকে জনসংহতি সমিতি এবং সাব কমিটি চারটি বিষযে ঐকমত্যে উপনীত হয়।

১৯৯৫ সালে ১৭ মার্চ উপেন্দ্রলাল চাকমা ঘোষণা করেন বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ পুরোপরি না মানলে শরণার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তন করবে না। তার আগে অবশ্য তিনি ভারতীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে খাগড়াছড়ি সফর করেন। ১২ জুলাই সাব কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির আরো এক দফা বেঠক দুদুকছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব রবিন র‍্যাফেল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ২৫ অক্টোবর জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সাব কমিটির সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ নিয়ে খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে কোনো চূড়ান্ত ফলাফল ছাড়াই ১৩টি বৈঠক করে জনসংহতি সমিতি। ১৬ নভেম্বর খাগড়াছড়ির এক জনসভায় খালেদা জিয়া শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানান। ১৯৯৬ সালের ২৪ জুন শান্তিবাহিনী ৮ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করে। ১১ জুন রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থানার লাইল্যাঘোনা থেকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহৃত হয়। ৬ জুলাই শান্তিবাহিনীর ৬ দফা চুক্তির বিরুদ্ধে PPSPC' ১৪ দফা দাবি পেশ করে। ৯ সেপ্টেম্বর শান্তিবাহিনীর চারজন সদস্য আত্মসমর্পণ করে।

একুশ বছর পর ক্ষমতায় আসার পর ৩০ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের ১১ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন

করে। ২১-২৪ ডিসেম্বর '৯৬ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে এবং ২৫-২৭ জানুয়ারি '৯৭ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় জনসংহতির সঙ্গে কমিটির দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১২-১৩ মার্চ পদ্মায় তৃতীয় বৈঠকের পর ২৮ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিলের মধ্যে ৬,৮০৮ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে। ১১-১৪ মে পদ্মায় চতুর্থ বৈঠকে উভয় পক্ষ একটি চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হয়। তার আগে কল্পরঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে ৮ এপ্রিল টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।

২ ডিসেম্বর '৯৭ সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে সরকার ও জনসংহতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের চূড়ান্ত লক্ষ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়। ঢাকায় এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন। সরকারের পক্ষে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি তথা শান্তিবাহিনীর পক্ষে সন্তু লারমা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বিএনপি শুরু থেকেই শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে আসছিল। চুক্তি স্বাক্ষর হলে দেশের এক-দশমাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের হয়ে যাবে, দেশ বিক্রি, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে তারা শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে আসছিল। এই শান্তিচুক্তিকে কেন্দ্র করে বিএনপির লংমার্চ, হরতাল আহ্বানসহ নানা রকম কর্মকাণ্ডের কথা পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে চুক্তির সমুদয় শর্ত নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হয়। শান্তিবাহিনী এটা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ যেহেতু অনেকটা উদারপন্থী সুতরাং এই দলটির শাসন আমলে যদি তারা চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যর্থ হয় তাহলে ভবিষ্যতে অন্য কোনো দল ক্ষমতায় এলে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগ সরকার যতোটা আন্তরিকতা দেখিয়েছে বিগত বছরগুলোতে কোনো সরকারই তা দেখায়নি। ফলে শান্তিবাহিনী তাদের যে পাঁচ দফা দাবির কথা বলে আসছিল সেখান থেকে অনেকাংশে সরে আসে। যেমন আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবি করেছিল শান্তিবাহিনী। এ দাবি থেকে তারা সরে আসে। এ দাবি বাস্তবায়ন করতে হলে সংবিধানের সংশোধনী আনতে হবে, যা বিরোধী দলের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। শান্তিচুক্তির প্রধান শর্ত হচ্ছে– যা কিছু করা হবে তা সংবিধানের আওতায় থেকেই করতে হবে।

শান্তিচুক্তির শর্তানুসারে ১০ ফেব্রুয়ারি প্রায় চল্লিশ হাজার পাহাড়ি বাঙালি, মন্ত্রীবর্গ এবং বিদেশী কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ জন সদস্যকে নিয়ে সন্তু লারমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। কিন্তু এদিন বিএনপি তিন পার্বত্য জেলাসহ চট্টগ্রামেও হরতাল ডাকে। যদিও সে হরতাল পুরোপুরি মার খেয়েছে। পাহাড়ি-বাঙালির এতো বড়ো মিলন মেলা স্মরণকালে সেদিনই ছিল প্রথম। চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব-দ্বিধা চলছিল সন্তু লারমা ও সরকারের মধ্যে তা কাটিয়ে তোলার লক্ষ্যে সন্তু লারমা সদলবলে ঢাকায় এসছিলেন আলোচনার উদ্দেশ্যে। সংসদে বিল আকারে তোলার আগে যেহেতু সন্তু লারমা কিংবা দলের অন্য কাউকে তা দেখানো হয়নি, দ্বন্দ্বটা মূলত সেখান থেকেই শুরু হয়েছে। অপরদিকে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছে শান্তিচুক্তির পর চার কিস্তিতে

শান্তিবাহিনীর যে সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করেছে তার বাইরে আরো অনেক অস্ত্র রয়ে গেছে। এমন অভিযোগও তোলা হচ্ছে– যে সব পাহাড়ি নাগরিক ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল তারা দেশে ফিরে আসার সময় অনেক ভারতীয় নাগরিকও বাংলাদেশে এসেছে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি প্রগতিশীল দৈনিক এ সম্পর্কে একটি রিপোর্টও প্রকাশ করেছিল। কিন্তু শান্তিবাহিনী প্রধান সন্তু লারমা এসব অভিযোগের জবাবে বাস্তবতার নিরিখে যুক্তি ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

জাতীয় সংসদে শান্তিচুক্তি পাস করা নিয়ে প্রধান বিরোধী দল যখন রেকর্ড সংখ্যক নোটিশ জমা দেয় এবং এ চুক্তি পাস না করার পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়, ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে সন্তু লারমা বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, সংসদে উত্থাপিত বিলের সঙ্গে শান্তিচুক্তির অনেক ক্ষেত্রেই মিল নেই। সন্তু লারমা এ মুহূর্তে কেন এমন কথা বললেন ঢাকায় সরকার পক্ষের সঙ্গে সন্তোষজনক আলোচনার পর এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংগঠন শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের যে চুক্তি হয়েছে তার সবকিছু মেনে নেয়নি। প্রকাশ্যে বিরোধিতা করার কারণে এই তিনটি সংগঠনের নেতাকর্মীদের নানাভাবে পুলিশী হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তাছাড়া পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেনস ফেডারেশন ও পাহাড়ি গণপরিষদের একটি পক্ষ থেকে সন্তু লারমা এবং তার দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে–এই তিনটি সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিনা কারণে, মিথ্যা অভিযোগে নানাভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। এরকম একাধিক অভিযোগ লিখিত আকারে সম্প্রতি ঢাকার একটি মানবাধিকার সংস্থার কাছেও এসেছে। এ অভিযোগগুলো যদি সত্য হয় তাহলে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের জন্য তা মোটেও শুভ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগ অনেক রক্ত ঝরেছে। আর রক্ত নয়–আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে সব রকম ছোটখাটো সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে হবে সন্তু লারমাকেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে তার মতো জনপ্রিয় নেতা আর নেই। সুতরাং পাহাড়ি নাগরিকদের ভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বিভক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র সন্তু লারমাই। তিনি শান্তিপূর্ণ পথে তা করবেন–এটা দেশবাসীর প্রত্যাশা।

জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত যে তিনটি বিল পাস হয়ে গেলো তা শান্তিচুক্তিরই চূড়ান্ত ফসল। এই ফসলকে আরো সমৃদ্ধ করা যেতো যদি প্রধান বিরোধী দলকে আলোচনার আরো বেশি সুযোগ দেয়া হতো। তিন বছর আট মাস নয়– তিন যুগ ধরেও যদি বিএনপিকে বলতে দেয়া হতো তবুও তারা শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধেই বলতো। এরপরেও বিএনপিকে বলতে দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কারণ আওয়ামী লীগ শাসিত বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক সরকার। গণতন্ত্রের প্রধান যে কথা, তা শান্তিচুক্তি সংসদে পাস করানোর সময় অনেকাংশে লংঘিত হয়েছে। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা, শান্তিচুক্তি করা এবং সংসদে তা পাস করা– সবকিছুই প্রশংসার দাবি রাখলেও প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে সংসদে যতোটা বলতে দেয়া উচিত ছিল তা না দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার শুধু গণতন্ত্রকেই অবমাননা করেনি, শান্তিচুক্তির মাধ্যেও কিছুটা কালিমা লেপন করে দিয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (JSS) শ্রেণী বিভাগ

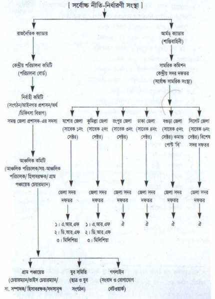

১. সভাপতি ঃ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) [ফিল্ড কমান্ডার]
২. সাধারণ সম্পাদক ঃ গৌতম চাকমা (অশোক) [পরিচালক, পররাষ্ট্র দপ্তর]
৩. সামরিক উপ-প্রধান (উত্তর) ঃ উষাতন তালুকদার (মেজর মলয়)
৪. পররাষ্ট্র দপ্তর (সহকারী পরিচালক) ঃ কালীমাধব চাকমা (মেজর মিহির)
৫. তথ্য ও প্রচার বিভাগ ঃ রূপায়ণ দেওয়ান (মেজর রিপ)
৬. শিক্ষা ও গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ মেজর শঙ্কর
৭. সামরিক উপ-প্রধান (দক্ষিণ) ঃ অংজয়
৮. জে.বি. ফোর্স কমাণ্ডর ঃ মেজর দেবাশীষ
৯. ত্রাণ ও পুনর্বাসন ঃ মেজর উত্তরণ
১০. রাজনৈতিক উপদেষ্টা ঃ মেজর যদুনাথ
১১. মারমা বিষয়ক উপদেষ্টা ঃ মেজর কংহ্লাউ
১২. ত্রিপুরা বিষয়ক উপদেষ্টা ঃ প্রণব
১৩. যুগ্ম পরিচালক (মুখ্য) ঃ মেজর সপ্তর্ষি
১৪. খাদ্য ও সরবরাহ বিষয়ক পরিচালক ঃ মেজর সমেশ
১৫. সদস্য ঃ লেকভার
১৬. সদস্য ঃ রবি
১৭. সদস্য ঃ মনোজ
১৮. সদস্য ঃ মন্টু
১৯. সদস্য ঃ কান্ত
২০. সদস্য ঃ ঈশ্বর
২১. সদস্য ঃ দেবাংশু
২২. সদস্য ঃ মর্কেশ
২৩. সদস্য ঃ পাইলট
২৪. সদস্য ঃ প্রতিম
২৫. সদস্য ঃ উপেন*

* শান্তিচুক্তির পর তিন পার্বত্য জেলায় সন্তু লারমার নেতৃত্বে JSS তিনটি আহবায়ক কমিটি গঠন করে– যা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত।

পাহাড়ি জনগণের আন্দোলনের স্তর বিন্যাস

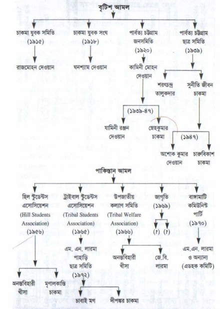

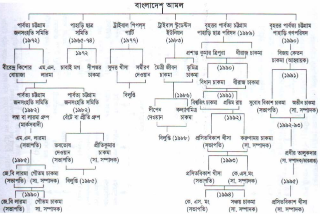
বাংলাদেশ আমল
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (১৯৭২)
পাহাড়ি ছাত্র সমিতি (১৯৬৫-৭৪)
ট্রাইবাল পিপল্‌স্ পার্টি (১৯৭৭)
ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (১৯৮৩)
বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (১৯৮৯)
বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি গণপরিষদ (১৯৯০)
বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা
এম.এন. লারমা
১৯৭২
চাবাই মগ
দীপঙ্কর চাকমা
সুদত্ত খীসা
সমীরণ দেওয়ান
বিলুপ্তি
মৈত্রী জীবন চাকমা
ভূমিত্র চাকমা
প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা
ধীরাজ চাকমা
বিজয় কেতন চাকমা (আহ্বায়ক)
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (১৯৮২) লম্বা বা লারমা গ্রুপ (মার্কসবাদী)
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (১৯৮২) বেঁটে বা প্রীতি গ্রুপ
(১৯৮৬)
দীপেন দেওয়ান
কল্যাণমিত্র চাকমা
বিলুপ্তি (১৯৮৮)
(১৯৯০)
বিধান চাকমা
ধীরাজ চাকমা
(১৯৯১)
বিশ্বজিৎ চাকমা
প্রতিম রায়
(১৯৯১)
সুবোধ বিকাশ চাকমা (সভাপতি)
অতীন চাকমা (সা. সম্পাদক)
(১৯৯২)
প্রসিতবিকাশ খীসা (সভাপতি)
করুণাময় চাকমা (সা. সম্পাদক)
(১৯৯২-৯৩)
প্রধীর তালুকদার (সা. সম্পাদক/ভারপ্রাপ্ত)
এম.এন. লারমা (সভাপতি)
ভবতোষ দেওয়ান (সভাপতি)
প্রীতিকুমার চাকমা (সা. সম্পাদক)
(১৯৮৫)
জে.বি লারমা (সভাপতি)
গৌতম চাকমা (সা. সম্পাদক)
বিলুপ্তি (১৯৮৫)
(১৯৯৩)
প্রসিতবিকাশ খীসা (সভাপতি)
কে.এস.মং (সা. সম্পাদক)
(১৯৯৫)
(১৯৯০)
জে.বি লারমা (সভাপতি)
গৌতম চাকমা সা. সম্পাদক)
(১৯৯৪)
কে. এস. মং (সভাপতি)
সঞ্চয় চাকমা (সা. সম্পাদক)
প্রসিতবিকাশ খীসা (সা. সম্পাদক)

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান কাছে থেকে দেখা

খাগড়াছড়ি শহরের মহাজনপাড়ায় মনিশংকর তালুকদার ওরফে মনীষ তালুকদারের বাড়ি। শান্তিবাহিনীতে তিনি লেফটেন্যান্ট পদে ছিলেন। ১৯৮৫ সালে মনীষ তালুকদার অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। বর্তমানে ঠিকাদারী ব্যবসা করছেন। এ বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের পরদিন ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি তন্ময় হয়ে একটার পর একটা গান শুনে যাই একজন পাহাড়ি নাগরিকের ঘরের বিছানায় শুয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বেজে চলেছে এ বাড়ির সে মেয়েটির ঘরে নয়, যিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন দর্শন বিভাগে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট বেজে চলছে এ বাড়ির মালিক স্বয়ং মনীষ তালুকদারের শোবার ঘরে। আমি মুগ্ধ হয়ে যাই একজন আদিবাসীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি গভীর টান দেখে। যিনি দিনটি শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে। যদিও বাংলা তার মাতৃভাষা নয়। রবীন্দ্রনাথের গান এই পাহাড়ি মানুষটির সঙ্গে আমার একটি অটুট সেতুবন্ধন গড়ে দিল মুহূর্তের মধ্যে। মনীষ তালুকদারকে এর আগে আমি কখনো দেখিনি, কথাও হয়নি। তবুও মনে হচ্ছিল এই প্রৌঢ় পাহাড়ি আমার অনেকদিনের আপন। আমার অতি কাছের মানুষ। আমরা একই দেশের মানুষ। একই ভূখণ্ডে আমাদের জন্ম। শুধু কিছু ব্যক্তি নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল এই মনীষ তালুকদারদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তাদের ঠেলে দেয়া হয়েছিল আত্মপরিচয় ও নিজের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে। যার অবসান ঘটেছে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে। আর এই সশস্ত্র যুদ্ধের অবসান ঘটলো ১০ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে। এক দেশকে যেভাবে দ্বিখণ্ডিত করে রাখা হয়েছিল, তার অবসান ঘটলো।

নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শহর খাগড়াছড়ি। এই শহরের এক প্রান্তে অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের একদিন আগে উদ্বোধন করা হয়েছে 'খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম'। শান্তিবাহিনীর অস্ত্র জমাদান উপলক্ষে সমস্ত শহরকে সাজানো হয়েছিল মনোরম সাজে। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসের কাছাকাছি শুধু কাঠ দিয়ে তৈরি একটি তোরণ দৃষ্টি কেড়েছিল অনেকেরই।

শান্তিবাহিনীর অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা ছিল সাড়ে এগারটায়। সকাল আটটা থেকেই খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের দর্শকদের আগমন শুরু হতে থাকে। দশটার মধ্যে স্টেডিয়ামের গ্যালারি ভরে যায়। ভিআইপি চেয়ারগুলোও স্বরাষ্ট্র সচিব প্রদত্ত কার্ডধারী লোকদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় সাড়ে দশটার মধ্যে। দু'জন বিদেশী টেকনিশিয়ান স্যাটেলাইট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দশটা পঞ্চাশ মিনিটেই

টেলিভিশনের ধারা বর্ণনা শুরু হয়ে যায়। ঘড়ির কাঁটা যখন ঠিক এগারটার ঘরে পৌছে জলপাই রঙের পোশাক পরিহিত শান্তিবাহিনীর সদস্যরা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে শুরু করেন। স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকের ভিভিআইপি গ্যালারির বাম পাশের একটি বিশেষ গেট দিয়ে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা মাঠে প্রবেশ করেন। পশ্চিম দিকে মুখ করে উত্তর-দক্ষিণে লম্বাভাবে চার সারিতে ৭৩৯টি কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার মাঠে সাজানো ছিল। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা সারিবদ্ধভাবে মাঠে প্রবেশ করে এই চেয়ারগুলোতে বসলেন। পেছনের দুই সারিতে যারা বসেছিলেন তাদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না, সামনের দুই সারির সদস্যদের হাতে ছিল একটি করে অস্ত্র। এগারটা পাঁচ মিনিটে মন্ত্রী, কূটনীতিক ও ঢাকা থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাঠে প্রবেশ করেন। শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা মাঠে প্রবেশ করতে শুরু করেন এগারটা দশ মিনিটে। প্রধানমন্ত্রী তখনো এসে পৌছেননি। মন্ত্রী ও বিদেশী কূটনীতিকরা সবাই মাঠের পশ্চিম দিকে ভিভিআইপি গ্যালারিতে উপস্থিত। ঠিক এ সময় এগারটা ছাব্বিশ মিনিটে পূর্বদিকের গ্যালারিতে একটি কালো কাপড়ে সাদা লেখা বড় ব্যানার মেলে ধরা হয় বিদেশী কূটনীতিক ও মন্ত্রীদের দিকে। এই ব্যানারে লেখা ছিল 'পার্বত্য চুক্তি মানি না/পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই।' এই শ্লোগানের ইংরেজী অনুবাদও বাংলার নিচে লেখা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে একদল সেনাবাহিনী দৌড়ে গিয়ে ব্যানারটি ছিনিয়ে নিতে চায়। কিন্তু যারা এ ব্যানার তুলে ধরেছে তাদের মধ্য থেকে একজন সদস্য জনৈক সেনা সদস্যকে ঘুষি মেরে ফেলে দেয়। ব্যানার উদ্ধার করতে না পারলেও তাদের কাছে যে লিফলেট ছিল, যা তারা হয়তো মাঠে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল সে লিফলেটগুলো সেনা সদস্যরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার ছয় মিনিটের মধ্যেই অর্থাৎ এগারটা বত্রিশ মিনিটে উক্ত স্থান থেকে একশো গজের মধ্যে একটি ব্যানার মেলে ধরা হয়। যাতে লেখা ছিল 'কল্পনা চাকমা অপহরণের জবাব চাই'। এর পাশাপাশি দক্ষিণ গ্যালারিতে আরো একটি ব্যানার মেলে ধরা হয়। যাতে লেখা ছিল, 'পাহাড়ীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে'। এই ব্যানারগুলো যেসব সংগঠন প্রদর্শন করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ইত্যাদি।এর প্রতিবাদে ঢাকা থেকে আগত কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতা সাদা কার্ড প্রদর্শন করে। এই সাদা কার্ডের কাউন্টার দিতে দেখা গেছে কালো পতাকা প্রদর্শন করে। যদিও সংখ্যায় তা নগণ্য। এর সব কিছুই ঘটেছে মন্ত্রীবর্গ ও বিদেশী কূটনীতিকদের সম্মুখে এবং স্টেডিয়ামের নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনির ভেতরে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব অনুষ্ঠানেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই উপস্থিত হন এ রকম কথা প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান শুরু হবার নির্দিষ্ট সময়ের চব্বিশ মিনিট পর অর্থাৎ এগারটা চুয়ান্ন মিনিটে তিনি পৌঁছেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সব অনুষ্ঠানেই জাতীয় সঙ্গীতের পর কোরআন, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল থেকে পাঠ করা হয়। কিন্তু খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে কোরআনের

পরই ত্রিপিটক পাঠ করা হয়েছে। গীতা থেকে পাঠ করা হয়েছে ত্রিপিটকের পরে। পার্বত্য জেলা তিনটি বৌদ্ধ অধ্যুষিত হওয়ায় সম্ভবত প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। এগারটা পঞ্চান্ন মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং প্রধানমন্ত্রী বারটা সাত মিনিটে তাঁর লিখিত ভাষণ শুরু করেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার পর পার্বত্য জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) মাঠে প্রবেশ করেন। তিনি মাঠে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিবাহিনীর সমুদয় সদস্য চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে যান। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা যে অস্ত্রটি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন তা বহন করে এনেছে সন্তু লারমার সঙ্গে মাঠে যে নিরাপত্তা কর্মকর্তাটি প্রবেশ করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছার পর তিনি সন্তু লারমার হাতে অস্ত্রটি হস্তান্তর করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে বারটা আটচল্লিশ মিনিটে সন্তু লারমা অস্ত্রটি সমর্পণ করেন। অস্ত্র গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী একতোড়া সাদা গোলাপ দিয়ে সন্তু লারমাকে বরণ করে নেন। এরপর উঁযাতন দেওয়ানের নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র জমা দেন। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র জমা শেষ হলে বারটা আটান্ন মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে দেন। বেলুনে লেখা ছিল 'শান্তি চিরন্তন হউক'।

এরপর সন্তু লারমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাম পাশের দু'টি চেয়ার বাদ দিয়ে মঞ্চে এসে বসেন। অবশ্য এর আগে যোগাযোগ কমিটির অন্য সদস্যরা স্টেডিয়ামের ভেতরেই বসা ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে অন্য কেউ বক্তৃতা করেননি। এমনকি সন্তু লারমাও তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। সন্তু লারমা বক্তব্য না রাখায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। প্রধানমন্ত্রী সন্তু লারমাকে নিয়ে শান্তিবাহিনীর জমাদানকৃত অস্ত্র পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে মঞ্চ থেকে মাঠে নেমে যান। অস্ত্র দেখা শেষে তারা শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সম্মুখ দিয়ে একবার হেঁটে যান।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
সোমবার, মার্চ ৬, ১৯৮৯
৫ম খণ্ড-বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৯৫/৬ই মার্চ, ১৯৮৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ৬ই মার্চ, ১৯৮৯ (২২শে ফাল্গুন, ১৩৯৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ–

১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত একটি বিশেষ এলাকা বিধায় উহার সর্বাংগীন উন্নয়নকল্পে উহার জন্য একটি পরিষদ স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।– (১) এই আইন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে, তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অ-উপজাতীয়" অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন;

(খ) "উপজাতীয়" অর্থ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাকমা, মারমা, তনচৈংগা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখু ও খেয়াং উপজাতির সদস্য;

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(ঙ) "পরিষদ" অর্থ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ;

(চ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ছ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(জ) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ;

(ঝ) "সদস্য" অর্থ পরিষদের সদস্য।

৩। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপন।– (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইবে।

(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। পরিষদের গঠন।– (১) নিম্নরূপ সদস্য-সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথাঃ–

(ক) চেয়ারম্যান ;

(খ) বিশ জন উপজাতীয় সদস্য ;

(গ) দশ জন অ-উপজাতীয় সদস্য;

(২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

(৩) উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে–

(ক) দশ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে;

(খ) চার জন নির্বাচিত হইবেন মারমা উপজাতি হইতে;

(গ) দুই জন নির্বাচিত হইবেন তনচৈংগা উপজাতি হইতে;

(ঘ) এক জন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে;

(ঙ) এক জন নির্বাচিত হইবেন লুসাই উপজাতি হইতে;

(চ) এক জন নির্বাচিত হইবেন পাংখু উপজাতি হইতে;

(ছ) এক জন নির্বাচিত হইবেন খেয়াং উপজাতি হইতে;

(৪) চেয়ারম্যান উপজাতীয়গণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য তাহা জেলার ডেপুটি কমিশনার স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি উপজাতীয় হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৫। চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।– (১) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য না হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

৬। উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।– (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, কোন উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এর বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি উপজাতির জন্য নির্ধারিত আসনে উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, অ-উপজাতীয় হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি অ-উপজাতীয়দের জন্য নির্ধারিত আসনে অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় বা অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি–

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) তাঁহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(গ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঘ) তিনি অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ত্যাগ করেন;

(ঙ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(ছ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন বা থাকেন ;

(জ) তিনি পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা পরিষদের কোন বিষয়ে তাঁহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের দোকানদার হন; অথবা

(ঝ) তাঁহার নিকট সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা বা কৃষি ব্যাংক হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে।

৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ।– চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন যথা ঃ–

"আমি......., পিতা বা স্বামী............, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।"

৮। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষনা।– চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্যা।– "পরিবারের সদস্য" বলিতে চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাঁহার সঙ্গে বসবাসকারী এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাঁহার ছেলেমেয়ে, পিতা-মাতা ও ভাইবোনকে বুঝাইবে।

৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা।– চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। পরিষদের মেয়াদ।– পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে তিন বৎসর ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নতুন পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।

১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ।–(১) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১২। চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ।– (১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাঁহার স্বীয় পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি–

(ক) যুক্তি সংগত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; অথবা

(গ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহা আত্মসাতের জন্য দায়ী হন।

ব্যাখ্যা।– এই উপ-ধারায় "অসদাচরণ" বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ইচ্ছাকৃত কুশাসনও বুঝাইবে।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন কারণে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না, যদি না বিধি অনুযায়ী তদুদ্দেশ্যে আহূত পরিষদের বিশেষ সভায় মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে তাঁহার অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্যকে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ দান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইলে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।

(৪) এই আইনে অন্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া।– (১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি–

(ক) তাঁহার নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি ধারা ৭ এ নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সরকার যথার্থ কারণে ইহা বর্ধিত করিতে পারিবেন;

(খ) তিনি ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে তাঁহার পদে থাকায় অযোগ্য হইয়া যানঃ

(গ) তিনি ধারা ১১ এর অধীনে তাঁহার পদ ত্যাগ করেন;

(ঘ) তিনি ধারা ১২ এর অধীনে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হন;

(ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন কি না সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে, নিস্পত্তির জন্য প্রশ্নটি পরিষদের সচিব কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা জজের নিকট প্রেরিত হইবে, এবং জেলা জজ যদি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্য অনুরূপ অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন না এবং জেলা জজের উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার তারিখ হইতে চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদটি শূন্য হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

১৪। অস্থায়ী চেয়ারম্যান।- চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাঁহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

১৫। আকস্মিক পদ শূন্যতা।- পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার একশত আশি দিন পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, পদটি শূন্য হইবার ষাট দিনের মধ্যে ইহা পূরণ করিতে হইবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

১৬। পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের সময়।-(১) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার তারিখে পূর্ববর্তী ষাট দিনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) পরিষদ বাতিল হইয়া গেলে, বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্বে পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১৭। ভোটার তালিকা।- জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাভুক্ত এলাকা সংক্রান্ত ভোটার তালিকার সেই অংশ পরিষদের যে কোন নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে।

১৮। ভোটাধিকার।- কোন ব্যক্তির নাম, ধারা ১৭তে উল্লিখিত ভোটার তালিকার আপাততঃ লিপিবদ্ধ থাকিলে তিনি পরিষদের যে কোন নির্বাচনের ভোট দিতে পারিবেন।

১৯। দুই পদের জন্য একই সংগে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ।- কোন ব্যক্তি একই সংগে চেয়ারম্যান এবং উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২০। নির্বাচন পরিচালনা।-(১) সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন, অতঃপর নির্বাচন কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনা করিবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার,প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।

(খ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;

(গ) প্রার্থীগণ কর্তৃক পদের জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্ত করণ;

(ঘ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহার ;

(ঙ) প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়োগ;

(চ) প্রতিদ্বন্দ্বীতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতা ক্ষেত্রে পদ্ধতি;

(ছ) ভোট গ্রহণের তালিকা, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(জ) ভোট দানের পদ্ধতি;

(ঝ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবন্টন;

(ঞ) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;

(ট) নির্বাচনী ব্যয়;

(ঠ) নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং উহার দণ্ড;

(ড) নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি; এবং

(ঢ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

(৩) উপ-ধারা(২) (ঠ) এর অধীন প্রণীত বিধিতে কারাদন্ড, অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দন্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদন্ডের মেয়াদ দুই বৎসরের অধিক এবং অর্থদন্ডের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হইবে না।

২১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ।- চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২২। পরিষদের কার্যাবলী।- প্রথম তফসিলে উল্লেখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হইবে এবং পরিষদ উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

২৩। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি।-এই আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার পরিষদের সম্মতিক্রমে-

(ক) পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; হস্তান্তর করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৪। নির্বাচনী ক্ষমতা।- (১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।

(২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হইবে হইবে।

২৫। কার্যাবলী নিষ্পন্ন।- (১) পরিষদের কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।

(২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য, সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) পরিষদের কোন সদস্য শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশ গ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(৪) পরিষদের প্রত্যেক সভায় কার্যবিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৬। চাকমা চীফের পরিষদের সভায় যোগদানের অধিকার।- রাঙ্গামাটি চাকমা চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের যে কোন সভায় যোগদান করিতে পরিবেন এবং পরিষদের কোন আলোচ্য বিষয়ে তাঁহার মতামত ব্যক্ত কতি পারিবেন।

২৭। কমিটি।- পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ কতিে পারিবে।

২৮। চুক্তি।- (১) পরিষদ কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি-

(ক) লিখিত হইতে হইবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে;

(খ) প্রবিধান অনুসারে সম্পাদিত হইতে হইবে।

(২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান চুক্তিটি সম্পর্কে উহাকে অবহিত করিবেন।

(৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন।

(৪) এই ধারার খেলাপ সম্পাদিত কোন চুক্তির দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

২৯। নির্মাণ কাজ।– পরিষদ প্রবিধান দ্বারা–

(ক) পরিষদ কর্তৃক সম্পদিত্য সকল নির্মাণকাজের পরিকল্পনা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করার বিধান করিবে;

(খ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কি শর্তে প্রযুক্তিগতভাবে বেং প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হইবে উহার বিধান করিবে;

(গ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব কাহার দ্বারা প্রণয়ন করা হইবে এবং উহা নির্মাণ কাজ কাহার দ্বারা সম্পাদন করা হইবে উহার বিধান করিবে।

৩০। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি।– পরিষদ–

(ক) উহার কার্যাবলীর নথিপত্র প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে।

(খ) প্রবিধানে উল্লিখিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রদান করিবে।

(গ) উহার কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সমান সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩১। পরিষদের সচিব।– রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার পদাধিকারবলে পরিষদের সচিব হইবেন।

(২) সচিবের দায়িত্ব হইবে পরিষদের সভা আহ্বান, সভাপরিচালনা ও সভার কার্যসূচী নিষ্পন্ন করার ব্যাপারে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।

৩২। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।– (১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।

(৩) পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতেপারিবে।

৩৩। ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি।– (১) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে পরিষদ, সরকারের

পূর্বানুমোদনক্রমে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারবর্গকে গ্র্যাচুইটি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী সামাজিক বীমা প্রকল্প চালু করিতে পারিবে এবং উহাতে তাঁহাদিগকে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) পরিষদ উহার কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী কল্যাণ তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উহার হইতে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত গ্র্যাচুইটি এবং প্রবিধান অনুযায়ী অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন গঠিত তহবিলে পরিষদ চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪। চাকুরী প্রবিধান– পরিষদ প্রবিধান দ্বারা–

(ক) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(খ) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এইরূপ সকল পদ নিয়োগের জন্য যোগ্যতা এবং নীতিমালা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান ও শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান করিতে পারিবে।

৩৫। পরিষদের তহবিল গঠন।– (১) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ তহবিল নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) পরিষদের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে যথা ঃ–

(ক) জেলা পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ;

(খ) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(ঘ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান–

(ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

(ছ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ;

(জ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৩৬। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি।– (১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারীতে বা সরকারী ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে রাখা হইবে।

(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ উহার তহবিলের কিছু অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

৩৭। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ।– (১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাইবে, যথা–

প্রথমতঃ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;

দ্বিতীয়তঃ এই আইনের অধীনে পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

তৃতীয়তঃ এ আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

চতুর্থতঃ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

পঞ্চমতঃ সরকার কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ–

(ক) পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মচারীর জন্য দেয় অর্থ;

(খ) সরকারের নির্দেশে পরিষদ সার্ভিসের রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব-নিরীক্ষণ বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য দেয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(৩) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সে ব্যক্তিকে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে, যতদূর সম্ভব, ঐ অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩৮। বাজেট।– (১) প্রতি অর্থ-বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) কোন অর্থ-বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে, সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার আদেশ দ্বারা, বাজেটটি সংশোধন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য প্রয়োজন হইলে, একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করার যাইবে এবং

উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

(৫) এই আইন মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথম বার যে অর্থ-বৎসরে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থ-বৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ-বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

৩৯। হিসাব।– (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষণ করা যাইবে।

(২) প্রতিটি অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পর পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য পরিষদ কার্যালয়ের কোন বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ পরিষদ বিবেচনা করিবে।

৪০। হিসাব নিরীক্ষা।– (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

(২) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ পরিষদের সকল হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল দেখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদের চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৩) হিসাব-নিরীক্ষার পর নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা ঃ–

(ক) অর্থ আত্মসাৎ;

(খ) পরিষদ তহবিলের লোকসান, অপচয় এবং অপপ্রয়োগ;

(গ) হিসাব রক্ষণে অনিয়ম;

(ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ ও অনিয়মের জন্য দায়ী তাহাদের নাম।

৪১। পরিষদের সম্পত্তি।–(১) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা–

(ক) পরিষদের উপর ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ-

(ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন সাধন করিতে পারিবে;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;

(গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা।– (১) পরিষদ উহার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে উহার তহবিলের সঙ্গতি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) উক্ত পরিকল্পনার নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকিবে; যথা–

(ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অর্থ যোগান হইবে এবং উহার তদারক ও বাস্তবায়ন হইবে;

(খ) কাহার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে;

(গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

(৩) পরিষদ উহার উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

৪৩। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়।– পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা উহার কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা পরিষদের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফেলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে ইহার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাঁহার এই দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং যে টাকার জন্য তাঁহাকে দায়ী করা হইবে সেই টাকা সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে তাহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর ইত্যাদি।– পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে।

৪৫। কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি।– (১) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হইবে, এবং সরকার ভিন্নরূপে নির্দেশ না দিলে, উক্ত আরোপের বিষয়টি আরোপের পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপের বা উহার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে সরকার যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।

৪৬। কর সংক্রান্ত দায়।– কোন ব্যক্তি বা জিনিসপত্রের উপর কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপ করা যাইবে কিনা। উহা নির্ধারণের প্রয়োজনে পরিষদ নোটিশের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সত্য সরবরাহ করিতে বা দলিলপত্র, হিসাব বহি বা জিনিসপত্র হাজির করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪৭। কর আদায়।– (১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে পরিষদের সকল কর, রেইট, টোল বা ফিস প্রবিধান দ্বারা, নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা এবং পদ্ধতিতে আদায় করা হইবে।

(২) পরিষদের প্রাপ্য অনাদায়ী সকল প্রকার কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৮। কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি।– প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় এবং সময়ের মধ্যে পেশকৃত লিখিত দরখাস্ত ছাড়া অন্য কোন পন্থায় এই আইনের অধীন ধার্য কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতদসংক্রান্ত কোন সম্পত্তির মূল্যায়ণ অথবা কোন ব্যক্তির উহা প্রদানের দায়িত্ব কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৯। কর প্রবিধান।–(১) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেইট, টোল বা ফিস এবং অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, আরোপ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

(২) এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কর দাতাদের করণীয় বিষয় এবং কর ধার্যকারী ও আদায়কারী কর্মকর্তা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিধান থাকিবে।

৫০। পরিষদের উপর তত্ত্বাবধান।– এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার পরিষদের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ।– (১) সরকার যদি এইরূপে অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ কর্তৃক বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইতে সরকার আদেশ দ্বারা–

(ক) পরিষদের কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব অথবা প্রদত্ত কোন আদেশের বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে;

(গ) প্রস্তাবিত কো কাজ-কর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিষদকে আদেশে উল্লিখিত কোন কাজ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন আদেশ প্রদত্ত পরিষদ আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট প্রতিবাদ করিতে পারিবে।

(৩) উক্ত প্রতিবাদ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার উক্ত আদেশটি হয় বহাল রাখিবে নতুবা সংশোধন অথবা বাতিল করিবে।

(৪) যদি কোন কারণে উল্লিখিত সময়ের মধ্য উক্ত আদেশ বহাল অথবা সংশোধন করা না হয় তাহা হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত।– (১) সরকার স্বেচ্ছায় অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে পরিষদের বিষয়াবলী সাধারণভাবে অথবা তৎসংক্রান্ত কোন বিশেষ ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত তদন্তের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীতব্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্যও নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের প্রয়োজনে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণের জন্য Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে কারিবে।

৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ।- (১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ-

(ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে;

(খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

(গ) সাধারণত এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;

(ঘ) অন্য কোন ভাবে উহার ক্ষমতার সীমা লংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে;

তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, পরিষদকে, উহার মেয়াদের অবশিষ্ট কর্যকালের অনধিক কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাতিল করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রকাশিত হইলে-

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহাদের পদে বহাল থাকিবেন না;

(খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।

(৩) বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনগঠিত হইবে।

৫৪। যুক্ত কমিটি।- পরিষদ অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত একত্রে উহাদের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য যুক্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কমিটিকে উহার যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ।- পরিষদ এবং অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫৬। অপরাধ।- তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত কোন করণীয় কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই প্রকার কাজ করা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

৫৭। দণ্ড।-এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক পঁচিশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

৫৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।-চেয়ারম্যান বা পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার।- চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৬০। অবৈধভাবে পদার্পণ।– (১) জনপথ ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অবৈধভাবে পদার্পণ করিবেন না।

(২) উক্তরূপ অবৈধ পদার্পণ হইলে পরিষদ নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধভাবে পদার্পণকারী ব্যক্তিকে তাঁহার অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করেন তাহা হইলে পরিষদ অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অবৈধ পদার্পণকারী কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেইজন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

(৩) অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করার প্রয়োজনে গৃহীত ব্যবস্থার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত পদার্পণকারীর উপর এই আইনের অধীন ধার্য কর বলিয়া গণ্য হইবে।

৬১। আপীল।– এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৬২। জেলা পুলিশ।– (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও তন্নিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।

(২) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত জেলা পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের চাকুরীর শর্তাবলী, তাঁহাদের প্রশিক্ষণ, সাজসজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাঁহাদের পরিচালনা অন্যান্য জেলা পুলিশের অনুরূপ হইবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পুলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন, উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৬৩। পুলিশের দায়িত্ব।– রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে ইহার তথ্য পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা এবং পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইহার কর্মকর্তাগণকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে।

৬৪। ভূমি হস্তান্তরে বাধানিষেধ।– আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ অনুমোদন

ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন জায়গা-জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত (Protected) ও রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন জায়গা-জমি বা বনের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৬৫। ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের উপর অর্পণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা জেলায় আদায়কৃত উক্ত করের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পরিষদের তহবিলে অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে।

৬৬। উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান।- (১) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাসিন্দা এমন উপজাতীয়গণের মধ্যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় কারবারী বা হেডম্যানের নিকট উত্থাপন করিতে হইবে এবং তিনি সংশ্লিষ্ট উপজাতীয়গণের মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) কারবারী বা হেডম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটি চাকমা চীফের নিকট আপীল করা যাইবে।

(৩) চাকমা চীফের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল নিষ্পত্তির পূর্বে তিনি সংশ্লিষ্ট উপজাতি হইতে তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন তিন জন উপজাতীয় বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৪) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা এই ধারায় উল্লিখিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য-

(ক) বিচার পদ্ধতি,

(খ) বিচার প্রার্থী ও আপীলকারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬৭। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সম্পর্কে আদেশ।- সরকার, প্রয়োজন হইলে, আদেশ দ্বারা পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে কাজের সমন্বয়ের বিধান করিতে পারিবে।

৬৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :-

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ;

(গ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্য কোন ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতি;

(ঘ) পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের পদ্ধতি;

(ঙ) পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা;

(চ) এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

৬৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের বা কোন বিধির বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে নিম্নরূপ সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :–

(ক) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা,

(খ) পরিষদের সভার ফোরাম নির্ধারণ,

(গ) পরিষদের সভায় প্রশ্ন উত্থাপন,

(ঘ) পরিষদের সভা আহবান,

(ঙ) পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লিখন,

(চ) পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন,

(ছ) সাধারণ সীলমোহরের হেফাজত ও ব্যবহার,

(জ) পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ,

(ঝ) পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং উহাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ,

(ঞ) কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়,

(ট) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এমন সকল পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও তাহাদের শৃঙ্খলা,

(ঠ) কর, রেইট, টোল এবং ফিস ধার্য ও আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়,

(ড) পরিষদের সম্পত্তিতে অবৈধ পদার্পণ নিয়ন্ত্রণ,

(ঢ) গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর বিক্রয় রেজিষ্ট্রীকরণ,

(ণ) এতিমখানা, বিধবা সদন এবং দরিদ্রদের ত্রাণ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্ট্রীকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ,

(ত) জনসাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(থ) টীকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন,

(দ) সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ,

(ধ) খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধ,

(ন) সমাজের বা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর বা বিরক্তিকর কার্যকলাপ প্রতিরোধ,

(প) বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ,

(ফ) জনসাধারণের ব্যবহার্য ফেরীর ব্যবস্থাপনার ও নিয়ন্ত্রণ,

(ব) গবাদী পশুর খোয়াড়ের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(ভ) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ,

(ম) মেলা প্রদর্শনী প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণ,

(ষ) বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন,

(র) ভিক্ষাবৃত্তি, কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ,

(ল) কোন কোন ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে এবং কি কি শর্তে উহা প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ,

(শ) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

(ত) পরিষদের বিবেচনায় যে প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সম্পর্কে জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

৭০। ক্ষমতা অর্পণ।– সরকার এই আইনের অধীন ইহার সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৭১। পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা।– (১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করিতে হইলে মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া একটি নোটিশ–

(ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের কার্যালয়ে প্রদান করিতে হইবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাঁহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করিতে হইবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

(২) উক্ত নোটিশ প্রদান বা পৌঁছানোর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌঁছানো হইয়াছে কিনা তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৭২। নোটিশ এবং উহা জারীকরণ।– (১) এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পালনের জন্য কোন কাজ করা বা না করা হইতে বিরত থাকা যদি ব্যক্তির কর্তব্য হয় তাহা হইলে কোন সময়ের মধ্যে ইহা করিতে হইবে বা ইহা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাঁহার উপর একটি নোটিশ জারী করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন নোটিশ গঠনগত ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না।

(৩) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল নোটিশ উহার প্রাপককে হাতে হাতে প্রদান করিয়া অথবা তাঁহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া বা তাঁহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন নির্দিষ্ট স্থানে আটিয়া দিয়া জারী করিতে হইবে।

(৪) যে নোটিশ সর্বসাধারণের জন্য তাহা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারী করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৩। প্রকাশ্য রেকর্ড।- এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিষ্টার Evidence Act, 1872 (I of 1872)- তে যে অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (public document) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে, প্রকাশ্য রেকর্ড (public document) বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, উহাকে বিশুদ্ধ রেকর্ড বা রেজিষ্টার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৭৪। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (public servant) গণ্য হইবেন।- পরিষদের চেয়ারম্যান ও উহার অন্যান্য সদস্য এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং পরিষদের পক্ষে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি Penal Code (Act XLV of 1860) এর senction 21 এ যে অর্থে জনসেবক (pulic servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।- এই আইন, বিধি বা প্রবিধান এর অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, পরিষদ বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৭৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপিত হইবার সংগে সংগে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ সনের ২৯নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে রহিত হইবে।

(২) উক্ত আইন উক্তরূপে রহিত হইবার পর-

(ক) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, অতঃপর উক্ত জেলা পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে।

(খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিধি, প্রবিধান ও বাই-ল, প্রদত্ত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল আদেশ, জারীকৃত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ এবং মঞ্জুরীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল লাইসেন্স ও অনুমতি, এই আইনের বিধানাবলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সকল বাই-ল প্রবিধান বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তি

সম্পর্কীয় উহার যাবতীয় অধিকার বা উহাতে ন্যস্ত যাবতীয় স্বার্থ পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(ঘ) উক্ত জেলা পরিষদের যে সকল ঋণ, দায় দায়িত্ব ছিল এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা পরিষদের ঋণ দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত সকল বাজেট, প্রকল্প ও পরিকল্পনা বা তৎকর্তৃক কৃত মূল্যায়ন ও নির্ধারিত কর, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং পরিষদ কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রণীত, কৃত বা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(চ) উক্ত জেলা পরিষদের প্রাপ্য সকল কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ এই আইনের অধীন পরিষদের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে;

(ছ) উক্ত আইন রহিত হইবার পূর্বে উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল ও ফিস এবং অন্যান্য দাবী, পরিষদ কর্তৃক, পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, একই হারে অব্যাহত থাকিবে;

(জ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিষদে বদলী হইবেন ও উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং তাঁহার উক্তরূপ বদলীর পূর্বে যে শর্তে চাকুরীরত ছিলেন, পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত না হইলে, সেই শর্তেই তাঁহারা উহার অধীনে চাকুরীরত থাকিবেন;

(ঝ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা-মোকদ্দমা চালু ছিল সেই সকল মামলা-মোকদ্দমা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৭। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি।- এই আইনে কোন কিছু করিবার জন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি উহা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে উক্ত কাজ বিধিদ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হইবে।

৭৮। অসুবিধা দূরীকরণ।- এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭৯। কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি।- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে, পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মনে করিলে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিকারমূলক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রথম তফসিল

পরিষদের কার্যাবলী

[ধারা ২২ দ্রষ্টব্য]

১। জেলার আইন শৃংখলা সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন।

২। জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন; উহাদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ; উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।

৩। শিক্ষা–

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ০ ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা ;

(ঘ) ছাত্রাবাস স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ'

(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান;

(ছ) বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা;

(জ) শিশু ছাত্রদের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ ও খাদ্যের ব্যবস্থা;

(ঝ) গরীব ও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ;

(ঞ) পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৪। স্বাস্থ্য–

(ক) হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিস্‌পেনসারী স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ;

(খ) ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল গঠন, চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের জন্য সমিতি গঠনে উৎসাহ দান;

(গ) ধাত্রী প্রশিক্ষণ;

(ঘ) ম্যালেরিা ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

(ঙ) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(চ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন;

(ছ) কম্পাউন্ডার, নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীর কার্য পরিদর্শন;

(জ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রস্তাব।

৬। কৃষি ও বন–

(ক) কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বা রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;

(গ) উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও কৃষকগণকে উক্ত যন্ত্রপাতি ধারে প্রদান;

(ঘ) পতিত জমি চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ;

(চ) কাপ্তাই জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের কোন ব্যাঘাত না ঘটাইয়া, বাঁধ নির্মাণে ও মেরামত এবং কৃষি কার্যে ব্যবহার্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন;

(জ) ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং জলাভূমির পানি নিষ্কাশন;

(ঝ) শস্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, ফসলের নিরাপত্তা বিধান, বপনের উদ্দেশ্যে বীজের ঋণ দান, রাসায়নিক সার বিতরণ এবং উহার ব্যবহার জনপ্রিয়করণ;

(ঞ) রাস্তার পার্শ্বে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও উহার সংরক্ষণ।

৭। পশু পালন–

(ক) পশুপাখী উন্নয়ন;

(খ) পশুপাখীর হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) পশু খাদ্যের মজুদ গড়িয়া তোলা;

(ঘ) গৃহপালিত পশুসম্পদ সংরক্ষণ;

(ঙ) চারণ ভূমির ব্যবস্থা ও উন্নয়ন;

(চ) পশু পাখীর ব্যাধি প্রতিরোধ ও দূরীকরণ এবং পশুপাখীর সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) দুগ্ধ পল্লী স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত আস্তাবলের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ;

(জ) গৃহপালিত পশু খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;

(ঝ) হাস-মুরগী খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;

(ঞ) গৃহপালিত পশু ও হাঁসমুরগী পালন উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) দুগ্ধ খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ।

৮। মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাক্ষেণ, মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

৯। সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং উহাতে উৎসাহ দান।

১০। শিল্প ও বাণিজ্য–

(ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং উহাতে উৎসাহ দান;

(খ) স্থানীয় ভিত্তিক বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(গ) হাট বাজার স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) গ্রামাঞ্চলে শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহএবং উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা ;

(ঙ) গ্রামভিত্তিক শিল্পের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(চ) গ্রাম বিপণী স্থাপন ও সংরক্ষণ।

১১। সমাজকল্যাণ–

(ক) দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, অনাথ আশ্রয়, এতিমখানা, বিধবা সদন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের দাফন বা অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা;

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ;

(ঘ) জনগণের মধ্যে সামাজিক, নাগরিক এবং দেশপ্রেমমূলক গুণাবলীর উন্নয়ন;

(ঙ) দরিদ্রদের জন্য আইনের সাহায্য (লিগ্যাল এইড) সংগঠন'

(চ) সালিশী ও আপোষের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) দুস্থ ও ছিন্নমূল পরিবারের সাহার্য ও পুনর্বাসন;

(জ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২। সংস্কৃতি–

(ক) সাধারণ ও উপজাতীয় সংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠন ও উহাতে উৎসাহ দান;

(খ) জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে রেডিওর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) যাদুঘর ও আর্ট-গ্যালারী স্থাপন ও প্রদর্শনীর সংগঠন'

(ঘ) পাবলিক হল ও কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং জনসভার জন্য স্থানের ব্যবস্থা;

(চ) নাগরিক শিক্ষার প্রসার, এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, স্বাস্থ্য সমাজ উন্নয়ন, কৃষি, শিক্ষা, গবাদি পশু, প্রজনন সম্পর্কিত এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর তথ্য প্রচার;

(ছ) জাতীয় দিবস ও উপজাতীয় উৎসবাদি উদ্‌যাপন;

(জ) বিশিষ্ট অতিথিগণের অভ্যর্থনা;

(ঝ) শরীরচর্চার উন্নয়ন, খেলাধুলায় উৎসাহ দান এবং সমাবেশ ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা ;

(ঞ) স্থানীয় এলাকায় ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্টসমূহ সংরক্ষণ;

(ট) তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঠ) সংস্কৃতি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা।

১৩। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।

১৪। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণে নহে এমন খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

১৫। জনসাধারণের ব্যবহার্য উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ।

১৬। সরাইখানা, ডাকবাংলা এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৭। সরকার কর্তৃক পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

১৯। পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা পাকাকরণ ও অন্যান্য জনহিতকর অত্যাবশ্যক কাজ করণ।

২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়নকল্পে নক্সা প্রণয়ন।

২১। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

দ্বিতীয় তফসিল

পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস

[ধারা ৪৪ দ্রষ্টব্য]

১। স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ।

২। বিজ্ঞাপনের উপর কর।

৩। পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরীর উপর টোল।

৪। পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেইট।

৫। পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস।

৬। পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমূলক কাজ হইতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস।

৭। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস।

৮। সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।

তৃতীয় তফসিল

এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ

[ধারা ৫৬ দ্রষ্টব্য]

১। পরিষদ কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, টোল, রেইট, ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।

২। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে পরিষদ কোন তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে পরিষদের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য সরবরাহ।

৩। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় সে কার্য বিনা লাইসেন্সে বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

৪। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন জনপথে অবৈধ পদার্পণ।

৫। পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোন কাজ করা।

৬। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হওয়ার এই আইনের অধীন কোন উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।

৭। জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, পায়খানা-পেশাব করানো বা গোসল করানো।

৮। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন পুকুরে বা ডোবায় অথবা উহার সন্নিকটে শন, পাট বা অন্য কোন গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।

৯। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা পাকা করা।

১০। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি খনন, পাথর বা অন্য কিছু খনন করা।

১১। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে ইটের ভাটি, চুন-ভাটি, কাঠ-কয়লা ভাটি ও মৃৎশিল্প স্থাপন।

১২। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

১৩। এই আইনের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন জমি বা ইমারত হইবে আবর্জনা জীবজন্তুর বিষ্ঠা, সার অথবা দুর্গন্ধযুক্ত কোন পদার্থ অপসারণে ব্যর্থতা।

১৪। এই আইনের অধীনে নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলকুণ্ডু, পানি, আবর্জনা অথবা বর্জিত পদার্থ রাখবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদনে অপসারণে, মেরামতে, পরিষ্কার করিতে, জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণ করিতে ব্যর্থতা।

১৫। এই আইনের অধীন কোন আগাছা, ঝোপঝাড় বা লতাগুল্ম জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষনা করা সত্ত্বেও, ইহা অপসারণ বা পরিষ্কার করিতে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের বা দখলদারের ব্যর্থতা।

১৬। জনপথ সংলগ্ন কোন স্থানে জন্মানো কোন আগাছা, লতাগুল্ম বা গাছপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির কোন পুকুর, কুয়া বা অন্য কোন উৎসের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বা পানি দূষিত করা সত্ত্বেও অথবা উহা এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের হানিকর বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলদার কর্তৃক উহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাঁটিয়া ফেলিতে ব্যর্থতা।

১৭। এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন শস্যের চাষ করা, সারের প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থার জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

১৮। এই আইনের বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলা ভরে পায়খানার গর্ত বা পায়খানার নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ কোন জনপথ বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোন নর্দমা খাল বা পয়ঃপ্রণালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

১৯। এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের জন্য কোন উৎস পরিষ্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা উহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২০। এই আইনের বিধান অনুযায়ী নির্দেশিত হইয়া কোন জমি বা দালান হইতে কোন পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা করিতে জমি বা দালানের মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২১। চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও পরিষদের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোন চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

২২। কোন দালানে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তির পরিষদকে খবর দিতে ব্যর্থতা।

২৩। সংক্রামক রোগজীবানুর দ্বারা আক্রান্ত কোন দালানকে রোগজীবাণু মুক্ত করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২৪। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করা।

২৫। রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন যানবাহনের মালিক চালক কর্তৃক উহাকে রোগজীবাণু মুক্ত করিতে ব্যর্থতা।

২৬। দুগ্ধের জন্য বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোন প্রাণীকে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া।

২৭। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী জবাই করা।

২৮। ক্রেতাকে চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা নিম্নমানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো।

২৯। ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি মিনতি করা বা শরীরের কোন বিকৃত বা গলিত অংশ বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।

৩০। এতদুদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ এলাকায় পতিতালয় স্থাপন বা পতিতাবৃত্তি পরিচালনা করা।

৩১। কোন বৃক্ষ বা উহার শাখা কর্তন বা কোন দালান বা উহার কোন অংশ নির্মাণ বা ভাংচুর এই আইনের অধীন জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক বা বিরক্তিকর বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও উহার কর্তন, নির্মাণ বা ভাংচুর।

৩২। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন রাস্তা নির্মাণ।

৩৩। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোন বিজ্ঞাপন নোটিশ, প্ল্যাকার্ড বা অন্য বা কোন প্রকার প্রচারপত্র আটিয়া দেওয়া।

৩৪। এই আইনের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তুপিকৃত করা।

৩৫। এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা, অথবা কোন রাস্তাতে

যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইবার স্থান হিসাবে অথবা তাবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৩৬। গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

৩৭। সূর্যাস্তের অর্ধঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের অর্ধঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন যানবাহনে যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

৩৮। যানবাহন চালানোর সময় সংগত কারণ ব্যতীত রাস্তার বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা একই দিকগামী অন্য কোন যানবাহনের ডান পার্শ্বে না থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি না মানা।

৩৯। এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া রেডিও বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ঢাকঢোল পিটানো, ভেপু বাজানো, অথবা কাঁসা বা অন্য কোন জিনিসের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা।

৪০। আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতসবাজী, এমনভাবে জোড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলায় বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোন সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪১। পথচারীদের বা পার্শ্ববর্তী এলাকার বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা তাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালান কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

৪২। এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্বীকৃত গোরস্থান বা শ্মশান ছাড়া অন্য কোথাও লাশ দাফন করা বা শবদাহ করা।

৪৩। হিংস্র কুকুর বা অন্য কোন ভয়ংকর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বা লেলাইয়া দেওয়া।

৪৪। এই আইনের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোন দালানকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা উহাকে মজবুত করিতে ব্যর্থতা।

৪৫। এই আইনের অধীন মনুষ্য-বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত দালান-কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাহাকেও উহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।

৪৬। এই আইনের বিধান মোতাবেক কোন দালান চুনকাম বা মেরামত করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে ব্যর্থতা।

৪৭। এই আইন বা কোন বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ বা ঘোষণা বা জারীকৃত কোন বিজ্ঞপ্তির খেলাপ।

৪৮। এই তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের চেষ্টা বা সহায়তা করা।*

---

* অপর দুইটি পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে রাঙ্গামাটির স্থলে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পড়তে হবে।

শান্তিচুক্তির পূর্ণ বিবরণ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিয়ে বর্ণিত চারি খণ্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন ঃ

ক) সাধারণ

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছে;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরিকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে;

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	ঃ	আহ্বায়ক
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান	ঃ	সদস্য
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি	ঃ	সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিনটি) আসন থাকিবে। এসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১,২,৩ ও ৪-মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলির প্রতিস্তাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে– "কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।"

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন্ সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার"– এর পরিবর্তে "হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন– অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'তিন বৎসর' শব্দগুলির পরিবর্তে 'পাঁচ বৎসর' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কেন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ"-এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ–ধারা (১) ও উপ–ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।"

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১)-এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থত এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য প্রয়োজন হইলে একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবেঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবেন। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারায় "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটির প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপধারাটি প্রণয়ন করা হইবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্নস্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাতত বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা' শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহএলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাষা (Fring Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বরধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবেঃ তবে শর্ত থাকে

যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২)-এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ"-এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে। পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধানে শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বর নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারার "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

খ) পুলিশ (স্থানীয়);

গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

ঘ) যুব কল্যাণ;

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

চ) স্থানীয় পর্যটন;

ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

ঞ) জন্ম-মৃত্যুর ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

ট) মহাজনী কারবার;

ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট,টোল এবং ফিস-এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি;

খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর।

ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ;

জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ;

ঞ) ব্যবসার উপর কর;

ট) লটারীর উপর কর;

ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০, ও ২১ নং আইন)-এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান	১জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ)	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ)	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গাা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে। অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের-ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রনয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপনির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

(ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিও'দের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারি শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবেঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ই মার্চ '৯৭ইং তারিখ এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ ৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভুমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ;

খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;

ঘ) বিভাগীয় কিমশনার/অতিরিক্ত কমিশনার;

ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটনের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রনাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদসকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার কিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগনের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনাবাহিনী (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা

সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারি, পারিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী।
২। চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ
৩। চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৪। চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৫। চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬। সাংসদ, রাঙ্গামাটি
৭। সাংসদ, খাগড়াছড়ি
৮। সাংসদ, বান্দরবান
৯। চাকমা রাজা
১০। বোমাং রাজা
১১। মংরাজা।

১২। তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসীদের তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলা ভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২ রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে	পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
(আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ)	(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
আহ্বায়ক	সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
বাংলাদেশ সরকার	

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মন্ত্রিসভায় আমার সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ,
সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ,
সম্মানিত উপজাতি নেতৃবৃন্দ,
মান্যবর কূটনীতিকবৃন্দ,
বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ,
সমবেত সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশে শান্তি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে একটি অনন্য দিন। আজকের এ শুভদিনে প্রথমেই আমি পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করছি এবং তাঁর রহমত কামনা করছি।

আপনারা জানেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে সমিতির ৬০০ জন সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়ে আজ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছেন। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রত্যাশায় আজ খাগড়াছড়ির নবনির্মিত স্টেডিয়ামে এই আন্তরিক অনুষ্ঠানে যারা অস্ত্র জমা দিচ্ছেন, আমি তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছি। তাঁদের বরণ করে নিচ্ছি অন্তরের গভীরতম ভালোবাসায়। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম আজ থেকে থেকে এ আনন্দময় ইতিহাসের অংশ এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলো। অনন্য এ ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম যাতে পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন ক্রীড়ার বিকাশ ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য এ স্টেডিয়ামকে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া কমপ্লেক্সে রূপান্তরের জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এ অস্ত্র জমাদান আমাদের দেশের ইতিহাসে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এক নবদিগন্তের সূচনা করবে। আমাদের দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে যা ত্বরান্বিত করবে। উপজাতি ও অ-উপজাতীয়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এদেশের সর্বস্তরের জনগণ এর সুফল ভোগ করবে। জনসংহতি সমিতির সদস্যবৃন্দ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এস নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের উন্নয়নেও অবদান রাখবেন বলে আমি আশা করি।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অবাধ-নিরপেক্ষ সুষ্ঠ নির্বাচনে জনগণের রায় নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। আমরা সরকার গঠন করার পর খোলামনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু

করেছিলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমাদের আলোচনার সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অতীতের সরকারগুলো কখনো কখনো সমস্যাটিকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এর সমাধান চেয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি মূলত ছিল একটি রাজনৈতিক সমস্যা। আমিই প্রথম ১৯৮২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে একটি সেল গঠন করা হয় এবং এ এলাকার ঘটনাবলির উপর সচেতন দৃষ্টি রাখা হয়। সমস্যা কি কি সমাধানের পথ কি ইত্যাদি বিষয়ে এই সেল দীর্ঘদিন কাজ করে এবং মাঝে মাঝে রিপোর্ট পেশ করতে থাকে। আর তাই সমস্যা নিরূপণ করা ও সমাধান খুঁজে পাওয়া আমাদের জন্য সহজ হয়।

দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য এলাকায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব আমরা অনুভব করি। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে দেশের দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ১১০ দিনের মাথায় চৌদ্দই অক্টোবর ১৯৯৬ তারিখে জাতীয় সংসদের মাননীয় চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। সরকারি ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজকর্মীদের এ কমিটির সদস্য করা হয়। এ জাতীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে বিএনপির ২ জন সংসদ সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে এ কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উভয়পক্ষ সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঢাকায় একনাগাড়ে তা অনুষ্ঠানে একমত হন। ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে পরবর্তী ৬টি বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপি দলীয় দু'জন সংসদ সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু, তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রথম থেকেই আমাদের প্রচেষ্টার প্রতি অসহযোগিতা মনোভাব প্রদর্শন করে আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা সমগ্র বিষয়টি সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। পক্ষান্তরে, সমস্যা সমাধানে বিগত বিএনপি সরকারের আমলে যে কমিটি গঠন করা হয় সে কমিটিকে আমরা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সবসময় সমর্থন দিয়ে এসেছিলাম। আমাদের দু'জন সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা এবং মোস্তাক আহমদ চৌধুরী জনসংহতি সমিতির সাথে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বৈঠকেই যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এমনকি আমরা যখন সংসদ থেকে পদত্যাগ করে পথে আন্দোলন করেছিলাম তখনও আমাদের সংসদ সদস্যরা দলীয়

স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে এ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। সমস্যার দ্রুত সমাধান যাতে হয় এজন্য বিএনপি সরকারকে আমরা সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলাম।

২৬ নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখ থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সপ্তম বৈঠক শেষে গত ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে সমগ্র জাতি এ চুক্তিকে শান্তি চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী মহল ছাড়া সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও অপাহাড়ি আপামর জনসাধারণসহ সমগ্র দেশবাসী ও বিশ্ববাসী এ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। বন্ধুপ্রতিম বিভিন্ন দেশসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থাও এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেছে। আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে বিএনপিসহ কয়েকটি সমমনা দল অযৌক্তিকভাবে ভুলতথ্য নির্ভর এবং একপেশে মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছেন। তাঁদের অনুরোধ করব অশান্তির পথ পরিহার করে শান্তির পথে আসুন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহসহ কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি বাবু জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং তার সহকর্মীবৃন্দ দেশের ও বিশ্বের বিরাজমান অবস্থার এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাস্তবতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সমস্যা সমাধানে প্রজ্ঞা ও সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। আমি এজন্য তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আলোচনা অনুষ্ঠানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে সহায়তা করেছেন আমি তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি কোনরূপ দ্বিধা সংশয় ছাড়াই স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং শাসনতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং আনুগত্য সমুন্নত রেখেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ বিষয়ে কারো মনে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝি, অস্পষ্টতা, দ্বিধা এবং দোদুল্যমানতা থাকা সমীচীন হবে না। দেশের সকল নাগরিকের বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ি বাঙালি সকলের অধিকার অতীতে যা ছিল তাই নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা তিনটিতে ডিসি-এসপি থাকবেন, থাকবেন পূর্বের ন্যায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী। বাঙালিরা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। গুচ্ছগ্রামবাসীরাও স্বভূমিতে থাকবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পাশাপাশি তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করবো। আমি আবারো দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ি-বাঙালি সবাই থাকবেন, কোন বাঙালিকে বলপূর্বক প্রত্যাহার করা হবে না।

আমি আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে কোন কারণে হোক না কেন আমাদের পাহাড়ি ভাইবোনদের একটি অংশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিগত সরকারগুলো শরণার্থীদের অন্তরে আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে পারেনি বলেই অধিকাংশ শরণার্থীই ভারতে থেকে যান। আমরা তাদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি। আমরা তাঁদের আশ্বস্ত করেছি যে দেশে তাঁদের প্রত্যাবর্তনকে নির্বিঘ্ন করা হবে, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে এবং তাদের যথাযথ পুনর্বাসন করা হবে। আমরা প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য ২০ দফা সুযোগ সুবিধা সম্বলিত প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। এ পর্যন্ত ৭,২৬৭টি শরণার্থী পরিবারের ৩৭,৯৯৬ জন সদস্য দেশে ফিরে এসেছেন। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য আমি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। শরণার্থীদের সকলকে সরকার প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যথোপযুক্তভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশা করি, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভারত থেকে সকল শরণার্থীর দেশে প্রত্যাবর্তন শেষ হবে। ফলে তাঁদের দুঃসহ শরণার্থী জীবনের অবসান ঘটবে। উপজাতীয় শরণার্থী শব্দটি আমাদের জীবন থেকে চিরদিনের মতো মুছে যাবে বলে আমি আশা করি।

এদেশ আমার আপনার- আমাদের সবার। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান অস্থিতিশীল অবস্থার অবসান ঘটবে। এখানে শান্তি ফিরে আসবে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলে এখানে পর্যটন শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হবে। এর সুফল পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীসহ সমগ্র দেশবাসী ভোগ করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন সংস্থা এবং বন্ধুরাষ্ট্রের কাছ থেকে ব্যাপক বিনিয়োগের সাড়া পাওয়া গেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে অপরিহার্য এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ফলে এখন এসব বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-অপাহাড়ি উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের দীর্ঘদিনের ইতিহাস রয়েছে। আমি আশা করি তা বজায় থাকবে এবং স্বার্থান্বেষী মহলের উষ্কানিতে কোনরূপ অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। আমরা বিশৃংখলা সৃষ্টি যে কোন অপচেষ্টাকে কঠোর হাতে দমন করতে বদ্ধপরিকর। আইন-শৃঙ্খলাসহ স্বাভাবিক অবস্থাবজায় রাখা হবে। আমাদের সরকার সকল নাগরিকের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এ চুক্তির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও সঠিক নেতৃত্ব। সকল মহলের সর্বাত্মক সহযোগিতায় আমরা এই দুরূহ কাজের সফল বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো ইনশাল্লাহ। আমি দেশবাসীর প্রতি বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ি-অপাহাড়ি বাঙালি সকল

শ্রেণীর জনগনের প্রতি এই চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অতীতের দুঃখজনক ঘটনাবলি এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আমরা ভুলে যেতে চাই। আমি জানি, পার্বত্য এলাকার সর্বস্তরের জনগণকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহে দীর্ঘদিন অনেক অসুবিধা ও অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সব কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতাকে অতীতের বিষয় হিসেবে গণ্য করে ভবিষ্যত সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধ এক নতুন জীবনের প্রত্যাশায় আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে কাজ করি।

আমরা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ পার্বত্য চট্টগ্রামকে সকল দিক থেকে উন্নয়নের আদর্শ এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আমাদের এ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আশু, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা। আশু কার্যক্রম বাবদ ১৫৮ কোটি ১৭ লাখ টাকা ইতোমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদী চাহিদা বাবদ ২৮৮ কোটি টাকা, মধ্য মেয়াদী চাহিদা বাবদ ৪৬৬ কোটি টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদী চাহিদা বাবদ ১২৩৭ কোটি টাকা প্রদানের জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সর্বমোট ২,১৪৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

আশুকরণীয় কর্মসূচির আওতায় শরণার্থীদের ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নগদ অর্থসাহায্য, খাদ্য সাহায্য ও গৃহ নির্মাণ সামগ্রী সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পুরাতন অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ। এছাড়া, এর আওতায় সড়ক, রাস্তা, পুল, সেতু, স্কুল, চিকিৎসালয়, গ্রামীণ সড়ক ও বাজারের উন্নয়ন ও সংস্কার এবং প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়ে চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে। কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রমও এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় রয়েছে শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন, মাটি ক্ষয়রোধ প্রকল্প, পাহাড়ি জমিতে উন্নত চাষ পদ্ধতির উদ্ভাবন, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, বাজার উন্নয়নসহ অন্যান্য কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় আমরা এ এলাকার প্রতিটি গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবো। প্রতিটি থানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য-উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বনজ, ফলমূল ও রাবার বাগান স্থাপন, কৃষিজাত শিল্পায়ন, বিদ্যুতায়ন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প।

এছাড়া, কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এ এলাকায় আরো সহস্রাধিক কোটি টাকার উন্নয়ন

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। শিশু নারীদের সার্বিক উন্নতির জন্যও এখানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা যাতে এ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে পারেন সেজন্য আমরা উৎসাহ প্রদান করছি। এ এলাকার শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে ইতোমধ্যে খাগড়াছড়ি, বান্দরবন এবং রাঙ্গামাটি জেলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ গঠিত হয়েছে। এ তিনটি জেলা চেম্বারকে ফেডারেশন অভ্ বাংলাদেশ চেম্বার অভ্ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ তাদের সদস্যভূক্ত করেছে। আশা করা যাচ্ছে, এ তিনটি জেলা চেম্বার এ এলাকার শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অচিরেই কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমরা পাহাড়ি জনগণের বৈচিত্র্যময় নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশেও ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এ এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশেও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, যা আপনারা অবগত আছেন। এ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের সমৃদ্ধ এক রূপসী এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এজন্য আমরা এ এলাকার উন্নয়নের সকলক্ষেত্রে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আশা করা যায় অচিরেই তার সুফল পাহাড়ি-বাঙালি সবাই ভোগ করবে।

ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু দেশের একটা অংশকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সংঘাতের পথ পরিহার করে শান্তি স্থাপনকেই আমরা শ্রেয় মনে করি এবং শান্তিই আমাদের সবার কাম্য। শান্তির পথেই স্থিতিশীলতা আসে, গণতন্ত্র বিকশিত হয়, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। আমরা তাই–

সংঘাত নয় শান্তি চাই
ধ্বংস নয় সৃষ্টি চাই
পশ্চাৎপদতা নয় অগ্রগতি চাই

বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা তাই কবির ভাষায় বলতে চাই– "জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক"। নতুন পথের যাত্রী আমরা নতুন শতাব্দীকে আমরা শান্তির বার্তা নিয়ে বরণ করতে চাই। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছেও আমার আবেদন থাকবে–নতুন শতাব্দী যেন শান্তিময় বিশ্ব হিসেবে নতুন সম্ভাবনারদ্বার উন্মোচন করে–এ লক্ষ্যে একাত্ম হয়ে কাজ করার।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজনকে সফল করতে সেনাবাহিনীর সকল স্তরের অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ, বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, পুলিশ-

বিডিআর, আনসার সদস্যবৃন্দ এবং রাজনৈতিক ও উপজাতি নেতা ও কর্মীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আসুন, দেশের উন্নয়নে, জনগণের উন্নয়নে আমরা দলমত-পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

শান্তির পথে, কল্যাণের পথে, অগ্রগতির পথে এবং উন্নয়নের পথে আমাদের অগ্রযাত্রার জয় হোক। খোদা আপনাদের সবার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনুন এ প্রার্থনা করি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
বাঙালি-পাহাড়ি সম্প্রীতি দীর্ঘজীবী হোক
খোদা হাফেজ

এক নজরে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন

- আনুমানিক ৫৯০ সালে চাকমা যুবরাজ বিজয়গিরি ও সেনাপতি রাধামন খীসা কর্তৃক রোয়াং রাজ্য (বর্তমান রামু), অক্সাদেশ (আরাকান সীমান্ত), খ্যাং দেশ, কাঞ্চননগর (কাঞ্চনদেশ) ও কালজর (কুকিরাজ্য) প্রভৃতি রাজ্য বিজিত হলে বিশাল 'পার্বত্য রাজ্য'-র (চাকোমাস?) পত্তন ঘটে;
- ১৫২০ সালে চাকমা রাজা জনুর সময় রাজ্যসীমা ছিল পূর্বে নাম্রে (বর্তমান নাফ নদী), পশ্চিমে সীতাকুণ্ড পাহাড়, দক্ষিণে সমুদ্র ও উত্তরে চাঁইচাল পর্বতশ্রেণী;
- ১৫৫০ সালে Joao De Barros নামে জনৈক পর্তুগিজের আঁকা মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর পূর্বতীরে দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে চাকোমাস (Chacomas) নামে একটি রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এর অবস্থান শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে এবং আরাকানের উত্তরে অর্থাৎ বর্তমান বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পর্যন্ত;
- ১৭১৪ সালের দিকে মুসলিম নবাবদের সাথে চাকমা রাজা জল্লাল খাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহ;
- ১৭১৫ সালে চাকমা রাজকুমার ফতে খাঁর সাথে মুসলিম নবাবদের শক্তি প্রতিষ্ঠা;
- ১৭৬০ সালের ১৫ অক্টোবর নবাব মীর কাশিম কর্তৃক চট্টগ্রামের শাসনভার ইংরেজদের কাছে অর্পণ;
- ১৭৭৭ ও ১৭৮১ সালে চাকমা রাজা শের দৌলত খাঁর সাথে ইংরেজদের দুইবার যুদ্ধ এবং চাকমা রাজার জয়লাভ;
- চাকমা রাজা জান বক্স খাঁর সাথে ইংরেজদের পরপর তিন বছর (১৭৮৩, ১৭৮৪ ও ১৭৮৫ সাল) যুদ্ধ;
- ১৭৮৭ সালে চাকমা রাজা জান বক্স খাঁর কলকাতায় গিয়ে বড়লাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ৫০০ মণ তুলা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা;
- ১৮৪৪ সালের চাকমা রানী কালিন্দীর সাথে ক্যাপ্টেন লইনের (Hill Superintendent) দ্বন্দ্ব;
- ১৮৬০ সালের ১ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে স্বতন্ত্র জেলার সৃষ্টি;
- ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'চাকোমাস' রাজ্যকে (বর্তমান বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম) তিনটি সার্কেলে বিভক্তিকরণ। এর আগে ১৮৭০ সালে ঘোষিত সার্কেল বিভক্তিকরণের বিরুদ্ধে কালিন্দীর আপিল অগ্রাহ্য করা হয়;
- ১৯০০ সালের ১ মে 'CHT'S regulation, 1900 Act' জারি;
- ১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম সংগঠন 'চাকমা যুবক সমিতি' গঠিত;
- ১৯১৮ সলে ঘনশ্যাম দওয়ানের নেতৃত্বে 'চাকমা যবিক সংঘ' গঠিত;

- ১৯২০ সালে কামিনীমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি' গঠিত;
- ১৯৩৯ সালে রাজ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি' গঠিত;
- ১৯৪৭ সালের ২০ আগষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের শাসন প্রতিষ্ঠা;
- পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৪৮ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন, ১৮৮১' বাতিলকরণ;
- ১৯৫৬ সালে অনন্তবিহারী খীসা ও মৃণালকান্তি চাকমার নেতৃত্বে 'Hill Students Association' গঠিত;
- ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৯৯ হাজার ৯শ' ৭৭ জন লোক বাস্তুহারা ও জমিহারা হয়ে পড়ে। এতে মোট চাষযোগ্য জমির ৫৪.০৬% অর্থাৎ ৫৪ হাজার একর আবাদি জমি প্লাবিত হয়;
- ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার 'বিশেষ এলাকা'র মর্যাদা বাতিল এবং উপজাতীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিকরণ;
- ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকারের পুনর্বাসনে অবহেলা ও অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৫০ হাজার নর-নারী ভারতে এবং ৩০ হাজার নর-নারীর উদ্বাস্তু হয়ে বার্মায় গমন;
- ১৯৬৫ সালের ১৮ জুন চট্টগ্রামে এম এন লারমার নেতৃত্বে "Tribal Students Association" গঠিত এবং একই সময়ে রাঙ্গামাটিতে ঐ সংগঠনের শাখা 'পাহাড়ি ছাত্র সমিতি' গঠিত;
- ১৯৬৬ সালর ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ছাত্রনেতা অনন্তবিহারী খীসা ও জে বি লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয়' পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি' ;
- ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে সদস্য নির্বাচিত এবং একই সময়ে এম এন লারমা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন;
- ১৯৭০ সালের ৬ মে তারিখে 'রাঙ্গামাটি কমিউনিষ্ট পার্টি' গঠিত;
- ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এম এন লারমার নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'। এতে এম এন লারমা আহবায়ক মনোনীত হন;
- ১৯৭২ সালের ২৪ জুন রাঙ্গামাটির ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র ৬০ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে বীরেন্দ্রকিশোর রোয়াজা এবং এম এন লারমা;
- ১৯৭১ সালের ২৯ জানুয়ারি চারুবিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা;

- ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এম এন লারমাসহ একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদলের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন;
- ১৯৭২ সালের ১ জুন বিভিন্ন গণদাবি ও ছাত্র দাবির প্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটির দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার ও লিফলেট শোভা পায় এবং ৯ জুন পাহাড়ি ছাত্র সমিতির জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে;
- ১৯৭২ সালের ২০ অক্টোবর 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' ও 'পাহাড়ি ছাত্র সমিতি' কর্তৃক খাগড়াছড়িতে বিডিআরদের ১৪টি গ্রাম লুট, বৌদ্ধ মন্দির তছনছ ও নারী ধর্ষণ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দু'টি পৃথক পৃথক তারবার্তা প্রেরণ;
- পাহাড়িদের ওপর সরকারি বাহিনীর নিয়মিত নির্যাতন, জুলুম ও ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি গঠিত হয় 'শান্তিবাহিনী' বা 'Peace Force';
- ১৯৭৩ সালে রাঙামাটি স্টেডিয়ামে এক নির্বাচনী সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপজাতিদের বাঙালিতে পরিণত করার ঘোষণা এবং চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের বিচার করার কথা ঘোষণা;
- ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে এম এন লারমা ও চাইথোয়াই রোয়াজা যথাক্রমে আওয়ামী লীগ প্রার্থী রাজকুমার সমিত রায় ও জাসদ প্রার্থী উপেন্দ্রলাল চাকমাকে পরাজিত করে সদস্য নির্বাচিত হন;
- ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠন করা হলে চারু বিকাশ চাকমা, অনন্তবিহারী খীসা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, কে এস প্রু এবং এম এন লারমা বাকশালে যোগ দেন;
- ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে শান্তিবাহিনী বিলাইছড়ি আর্মড পুলিশ ক্যাম্প ও খাগড়াছড়ির বেতছড়ি গ্রামে পুলিশের নৌকায় সফল হামলার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র কার্যকলাপের সূচনা করে;
- ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক রাজমাতা বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা নিয়োগ। এই সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়;
- ১৯৭৭ সালের ৪ জুলাই জিয়া সরকার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে 'ট্রাইবাল কনভেনশন' গঠন করেন;
- ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাসদ প্রার্থী উপেন্দ্রলাল চাকমা ও স্বতন্ত্রপ্রার্থী অং শোয়ে প্রু চৌধুরীর জয়লাভ। পরে অং শোয়ে প্রু চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করা ও তাঁর বিএনপি-তে যোগদান;
- রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজমাতা বিনীতা রায়ের পরিবর্তে বাবু সুবিমল দেওয়ানকে উপদেষ্টা নিয়োগ;
- ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে এক গোপন বৈঠকে ৩০,০০০ বাঙালি পরিবারকে পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এর জন্য ৬৫ কোটি টাকাও বরাদ্দ করা হয়;
- ১৯৮০ সালে সংসদে 'উপদ্রুত এলাকা' বিল উত্থাপন ও পরে বিরোধীদলের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তা প্রত্যাহার করা হয়;

- ১৯৮০ সালে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন;
- ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ কাউখালি উপজেলার কমলপতি গ্রামে বৌদ্ধমন্দিরে সামরিক বাহিনীর ব্রাশ ফায়ারে বহু উপজাতীয় নর-নারী নিহত এবং দাঙ্গায় শতাধিক উপজাতি নিহত হয়;
- ১৯৮০ সালের ২১ এপ্রিল ঢাকা প্রেস ক্লাবে তিনজন সংসদ সদস্য (যাঁরা উপরিউক্ত ঘটনার অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন) শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্রলাল চাকমা সাংবাদিকদের কাছে কমলপতি গ্রামের ঘটনা ব্যাখ্যা করেন;
- ১৯৮০ সালের ৯ আগষ্ট স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রায় তিনশ লোক কর্তৃক আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ ভিসা অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের দাবি করে স্মারকলিপি পেশ ;
- ১৯৮১ সালে এক লক্ষ বাঙালি পরিবারকে ৫ একর জমি ও নগদ ৩ হাজার ৬শ টাকা দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়;
- ১৯৮২ সালের ৯ জানুয়ারি দ্বিতীয় 'ট্রাইবাল কনভেনশন' বান্দরবান জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়;
- ১৯৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে আটদিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় কংগ্রেস শুরু হয় এবং ৩০ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হয়। কংগ্রেসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে;
- ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন শান্তিবাহিনীর দু'টি উপদলের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ব্যাপক হাঙ্গামা শুরু হয়;
- ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রপতি এরশাদ শান্তিবাহিনীর প্রতি সাধারণ ঘোষণা করেন এবং পর্যায়ক্রমে তা ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়;
- ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপের সুইসাইড স্কোয়াডের হামলায় এম এন লারমা অটজন সহয়োগীসহ নিহত হন;
- ১৯৮৪ সালের ১৯ জানুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলার মারিশ্যা নামক স্থান থেকে শেলওয়েল কোম্পানির ৫ জন বিশেষজ্ঞকে শান্তিবাহিনী অপহরণ করে;
- ১৯৮৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ৮,৫০,০০০ স্থানীয় মুদ্রা, ৪,০০০ ডলার, ৬০০ পাউণ্ড মুদ্রা, ১৯ কে জি সোনা একটি রঙিন টি ভি, একটি ব্যাটারি চার্জার, একটি তাঁবু, একটি মুভি ক্যামেরা ও একটি ডুপ্লিকেটিং মেশিনের বিনিময়ে অপহৃত ৫ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে মুক্তি দেয়;
- ১৯৮৪ সালের ১০মে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য ২৬৩ কোটি টাকার বিশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ১৯৮৪ সালের ৩১মে শান্তিবাহিনীর হামলায় বরকল উপজেলার ভূষণছড়া গ্রামে ৩২ জন পূনর্বাসিত অ-উপজাতীয় নিহত হয়। সামরিক বাহিনীর ছত্রছাত্রায় পুনর্বাসিত অ-উপজাতীয়দের হামলায় ৫২ জন উপজাতীয় লোক নিহত হয়;

- ১৯৮৪ সালের ১৮ আগষ্ট শান্তিবাহিনীর হামলায় রাঙামাটি শহরে দু'জন লোক নিহত হয়;
- ১৯৮৪ সালের ২৮ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থ বিষয়ক সদস্য জনাব সুলতান মাহমুদ ও তাঁর তিন সঙ্গীকে বান্দরবানের চিম্বুক রেষ্ট হাউস থেকে শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহরণ;
- ১৯৮৫ সালের ১৮ এপ্রিল শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপ কর্তৃক সরকারের কাছে স্বারকলিপি পেশ এবং সরকারের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর দশটি বিষয়ে ঐকমত্য;
- ১৯৮৫ সালের ১৯ এপ্রিল শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপ একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে সরকারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং শান্তিবাহিনীর ৫৫ জন অফিসারসহ ২৩৩ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করে;
- ১৯৮৫ সালের ২৯ এপ্রিল শান্তিবাহিনী কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তবলছড়ি গ্রামে হামলা চালিয়ে ৩ ব্যক্তিকে হত্যা;
- ১৯৮৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর হামলায় সেনাবাহিনীর দু'জন অফিসার নিহত হন;
- ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর খাগড়াছড়ি জেলার পুজগাং-এ বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে প্রথম শান্তি আলোচনা শুরু হয়;
- ১৯৮৬ সালের ২৪ মে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের জন্য এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত;
- ১৯৮৬ সালের ১১ অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার, সামরিকীকরণ, উপজাতীয় নির্যাতন ও শরণার্থী সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে 'Human Rights in the Chitagong Hill Tracts. Bangladesh' শীর্ষক একটি সেমিনার নেদারল্যান্ডের রাজধানী আমষ্টারডামে অনুষ্ঠিত হয়;
- ১৯৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠকের আয়োজন পণ্ড;
- ১৯৮৭ সালের ৫ জুন গোলযোগের কারণে উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবর্তন পণ্ড;
- ১৯৮৭ সালের ২ জুলাই ভারতের মিজোরাম রাজ্যের ডেমাগ্রিতে বাংলাদেশের বিডিআর ও ভারতের বিএসএফ-এর মধ্যে ফ্ল্যাগ বৈঠক অনুষ্ঠিত;
- ১৯৮৭ সালের ১৬ আগষ্ট সরকারি উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুতে ১৭ জন উপজাতীয় নেতা ও স্থানীয় অ-উপজাতীয় নেতার মধ্যে শান্তিচুক্তি সই;
- ১৯৮৭ সালের ১৭ আগষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সমস্যা ও শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পিভি নরসীমা রাওয়ের বাংলাদেশে আগমন;
- ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে নেপালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরো কর্তৃক বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় বৌদ্ধদের ওপর নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ উত্থাপন;

- ১৯৮৭ সালের ২৯ আগষ্ট ভারতের সাবরুমে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক ও ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে জেলা পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠান;
- ১৯৮৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার পুজগাং কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত। এই বৈঠকে জনসংহতি সমিতি তাদের ঐতিহাসিক পাঁচ দফা দাবি সরকারের কাছে উত্থাপন করে;
- ১৯৮৮ সালের ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে তৃতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত;
- ১৯৮৮ সালের ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলার পুজগাং-এ চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত ;
- ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে শান্তিবাহিনী কর্তৃক খাগড়াছড়ি ও অন্যান্য স্থানে ৪২ ব্যক্তিকে হত্যা;
- ১৯৮৮ সালের ৩০ এপ্রিল বিশেষ মহলের সহযোগিতায় খাগড়াছড়িতে জনকল্যাণ পরিষদ গঠিত;
- ১৯৮৮ সালের ১০ জুন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ফারুক আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গমন এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ঈশ্বরী প্রসাদগুপ্তের সাথে আগরতলায় আলোচনা;
- ১৯৮৮ সালের ১৯ জুন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের পঞ্চম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত;
- ১৯৮৮ সালের ৯ জুলাই ফারুক আহমদ চৌধুরীর নেতত্বে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদলের ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন এবং তাদের দেশে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন;
- ১৯৮৮ সালের ৫ অক্টোবর রাঙ্গামাটির ২১ সদস্যবিশিষ্ট পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের কমিটি থেকে রাজা দেবাশীষ রায়ের নাম প্রত্যাহার; পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে না-এই অভিমত ব্যক্ত করে কমিটি থেকে তাঁর নিজের নাম প্রত্যাহার;
- ১৯৮৮ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার ও পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঢাকায় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর;
- ১৯৮৮ সালের ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ষষ্ঠ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত;
- ১৯৮৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর ট্রাইবাল কনভেনশনের রাঙ্গামাটি জেলার আহ্বায়ক ও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান শান্তিময় দেওয়ান আততায়ীর গুলিতে নিহত হন;
- **১৯৮৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কমিটির সাথে খাগড়াছড়িতে জেলার পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের বৈঠক অনুষ্ঠিত;**

- ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটির সাথে পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের বৈঠক অনুষ্ঠিত। জাতীয় সংসদে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ বিষয়ক ৪টি বিল পাস;
- ১৯৮৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে ৫৪ জন পাহাড়ী নেতা ও ১০ জন অ-উপজাতীয় নেতার মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর। স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল পাস হওয়ার প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতির শান্তি আলোচনা প্রত্যাখ্যান;
- ১৯৮৯ সালের ১২ মার্চ উপ-প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত;
- ১৯৮৯ সালের ১৪ মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত;
- ১৯৮৯ সালের ১৬ মার্চ সামরিক বাহিনী কর্তৃক মহালছড়িতে 'শান্তিবাহিনী প্রতিরোধ কমিটি' নামে ৪৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন;
- ১৯৮৯ সালের ২৩ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৮৯ সালের মে পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর প্রতি সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ বর্ধিত;
- ১৯৮৯ সালের ২৪ এপ্রিল প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ টি এম মাসউদ কর্তৃক ২৫ জুন তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা;
- ১৯৮৯ সালের ৪ মে আততায়ীর গুলিতে লংগদু উপজেলা চেয়ারম্যান ও 'পার্বত্য বার্তার' সম্পাদক আবদুর রশিদ নিহত;
- ১৯৮৯ সালের ৯ মে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে শান্তিবাহিনীর হামলায় ৫ জন বিডিআর সদস্য নিহত;
- ১৯৮৯ সালের ৩১ মে সাবেক সংসদ সদস্য উপেন্দ্রলাল চাকমার ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় প্রার্থনা;
- ১৯৮৯ সালের ২৫ জুন ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত;
- ১৯৮৯ সালের ৪ মে রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু ২৫ জন পাহাড়ী নিহত এবং ৫০ জনেরও অধিক আহত হয়;
- ১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই শান্তিবাহিনী রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত রেডিও রিলে স্টেশন দখল করে;
- ১৯৯০ সালের ৮ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাত সদস্যবিশিষ্ট 'Chittagong Hill Tracts commission' নামে একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে;
- ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর ঢাকায় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল এবং সংবাদ সম্মেলনে জেলা পরিষদ বাতিল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান দাবি;

- ১৯৯০ সালের ২৭ ডিসেম্বর পুনর্বাসিত বাঙালি কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়িতে চারজন পাহাড়ীকে হত্যা;
- ১৯৯০ সালের ৩০ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে শহীদ ডা. মিলন চত্বরে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি গণপরিষদের এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠান এবং এখান থেকে জেলা পরিষদ বাতিল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান দাবি। পরে নগরীতে এক বিক্ষোভ মিছিল ও কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি পেশ এবং বিকেলে প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন;
- ১৯৯০ সালের ১৯ অক্টোবর সেনাবাহিনীর ৬৫ ব্রিগেডের জোয়ানদের দ্বারা রাঙ্গামাটিতে ১৪ জন কিশোরী ধর্ষিত;
- ১৯৯১ সালের ১৬ মার্চ রাঙ্গামাটি জেলার ভূষণছড়ায় শান্তিবাহিনীর হামলায় ৬ জন অ-উপজাতীয় লোকের মৃত্যু;
- ১৯৯১ সালের ২৩ মার্চ শান্তিবাহিনীর হামলায় রাঙ্গামাটির লংগদু উপজেলার ছোট মাহিল্যায় ৩ জন হতাহত;
- ১৯৯১ সালের মে মাসে ইউরোপে ফিরে CHT কমিশন কর্তৃক ১২৭ পৃষ্ঠা 'LIFE IS NOT OURS' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ;
- ১৯৯১ সালের ৯ জুন ঢাকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কাউন্সিল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত। বৈঠকে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন '৮৯ তোমাবেক যাবতীয় বিষয় হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত;
- ১৯৯১ সালের ১ আগষ্ট ভারতের মিজোরাম রাজ্যের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ভারতের প্রভাব খাটানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী পি ভি নরসীমা রাওয়ের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ। স্মারকলিপিতে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ;
- ১৯৯১ সালের ২১ আগষ্ট রাঙ্গামাটির মারিশ্যা বাজারে বোমা বিস্ফোরণে ১ জন পাহাড়ী নিহত ও ৭ জন আহত;
- ১৯৯১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর জার্মানির হামবুর্গ শহরে চারদিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক তৃতীয় আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত। এতে বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন, সাহায্য ও মানবাধিকার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন;
- ১৯৯১ সারের ২৩ অক্টোবর শান্তিবাহিনীর প্রতি সরকারের পঞ্চমবারের মতো সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা;
- ১৯৯১ সালের ২৪ অক্টোবর ভারত সীমান্তে কবুবক নামক স্থানে জনৈক শান্তিবাহিনীর অধিনায়কের সরকারের সাধারণ ক্ষমা প্রত্যাখ্যান। তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা প্রসঙ্গে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নয়;
- ১০ এপ্রিল, ১৯৯২; আততায়ীর হাতে একজন অ-উপজাতীয় রাখাল নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আনসার, ভিডিপি ও বাঙালিরা পাহাড়ী গুচ্ছগ্রামে

হামলা চালালে সরকারি হিসেব মতে, ১৪ জন নিহত এবং ৫০০টি ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হয়। বেসরকারি হিসেব মতে, এই সংখ্যা ১২০০-এর ওপর। তবে নিরপেক্ষ সূত্র মতে, ১৩৭-এর মতো;

- ১২ এপ্রিল, ১৯৯২ ঃ লোগাং হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হাজার হাজার নর-নারীর ঐতিহাসিক শোকমিছিল;
- ১৩ এপ্রিল, ১৯৯২ ঃ পাহাড়ি জনগণ কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐতিহ্যবাহী চৈত্রসংক্রান্তি 'বৈসাবি' বর্জন;
- ২০ এপ্রিল, ১৯৯২ ঃ খাগড়াছড়ি থেকে ঢাকায় ফিরে গিয়ে ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি (রাজনীতিবিদ, আইনজীবী,সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও ছাত্রনেতৃবৃন্দ) কর্তৃক লোগাং হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে বিবৃতিদান;
- ২৭ এপ্রিল, ১৯৯২ ঃ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা লোগাং হত্যাকাণ্ডের স্থান পরিদর্শন করে এর তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন;
- এপ্রিল, ১৯৯২ ঃ সাহায্যদাতা গোষ্ঠীর প্যারিস কনসোর্টিয়াম বৈঠক বাংলাদেশ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত তথ্য জানানোর জন্য শর্তারোপ;
- মে, ১৯৯২ ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক ভারত সফর এবং উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের সাথে তাঁর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত;
- ১২ মে, ১৯৯২ ঃ সরকার ও জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার জন্য গঠিত 'যোগাযোগ কমিটি'-কে সরকারের বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন;
- ২০ মে, ১৯৯২ ঃ মহল বিশেষের ছত্রছায়ায় স্থানীয় অ-উপজাতীয় কর্তৃক পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে হামলা এবং শতাধিক পাহাড়ী নাগরিকদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ;
- ১২ জুন, ১৯৯২ ঃ 'সারভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক লোগাং হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশ;
- ১৭ জুন, ১৯৯২ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের অশান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ ও সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানিয়ে ৫ দল কর্তৃক এক সংবাদ সম্মেলন ;
- ৩০ জুলাই, ১৯৯২ ঃ চট্টগ্রামের ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান কর্তৃক পাহাড়ি জনগণের প্রতি সেনাবাহিনীর বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন ;
- ১০ আগষ্ট, ১৯৯২ ঃ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে একতরফাভাবে তিনমাসের জন্য অস্ত্র-বিরতি ঘোষণা ;

- ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ঃ সরকারের সাথে আলোচনার প্রস্তুতি হিসেবে বৈঠকের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় চূড়ান্ত করার জন্য যোগাযোগ কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত ;
- ১৩ অক্টোবর, ১৯৯২ ঃ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ দীঘিনালা থানা কমিটি গঠন উপলক্ষে পূর্ব নির্ধারিত সভায় বিশেষ মহল কর্তৃক হামলা; বরদাশ মনি চাকমা নিহত; কারফিউ জারি।
- ১৫ অক্টোবর, ১৯৯২ ঃ ঢাকায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কর্তৃক দীঘিনামলা হত্যাকাণ্ড ও আটক ছয়জন ছাত্রনেতার মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ ও সমাবেশের আয়োজন; খাগড়াছড়িতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ২২ অক্টোবর পর্যন্ত জেলার আটটি থানায় মিটিং-মিছিল ও সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা ;
- ৫ নভেম্বর, ১৯৯২ ঃ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বহুল আলোচিত বৈঠক অনুষ্ঠিত ;
- ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ ঃ সরকার ও পর্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত এবং JSS কর্তৃক ঐতিহাসিক ৫ দফা দাবিনামা (সংশোধিত) হস্তান্তর ও ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে বন্ধ রাখার ব্যাপারে ঐকমত্য ;
- ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯২ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক সরকারের সাথে তাদের বৈঠক ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন ;
- ২ মে ও ৯ মে, ১৯৯৩ ঃ যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অব,) আলি আহমদের নেতৃত্বে ১১ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদলের ভারত সফর এবং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে এক চুক্তিতে উপনীত। ৮ জুন থেকে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্য;
- ২২ মে, ১৯৯৩ ঃ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত এবং অস্ত্রবিরতির মেয়াদ ৩১ আগষ্ট, ১৯৯৩ পর্যন্ত বর্ধিত;
- ১১ জুলাই, ১৯৯৩ ঃ জুম্মু শরণার্থী কল্যাণ সমিতির ১৩-দফা দাবিনামা প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত এবং ১৩-দফা দাবিনামার আংশিক পূরণ ;
- ১৩ জুলাই, ১৯৯৩ ঃ রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে তিনজন এমপি-র এক প্রতিনিধিদলের ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির গমন এবং শরণার্থী নেতাদের কাছে সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত প্রস্তাব হস্তান্তর;
- ১৪ জুলাই, ১৯৯৩ ঃ সরকার ও JSS-এর মধ্যে চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত এবং নভেম্বরের পরে স্থাপিত ক্যাম্পসমূহ গুটিয়ে নেয়া ও উপজাতীয় শরণার্থীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংবলিত কাগজপত্র সরকার কর্তৃক প্রতিপক্ষের কাছে হস্তান্তর। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্ত্র-বিরতি বর্ধিত;
- ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ ঃ জে.এস.এস ও সরকারি কমিটির মধ্যে পঞ্চম বৈঠক অনুষ্ঠিত। সরকারি কমিটি কর্তৃক ৫ দফা দাবিনামার প্রেক্ষিতে ৮ পৃষ্ঠার একটি

জবাব হস্তান্তর। যুক্তি, পাল্টা-যুক্তি, তর্ক-বিতর্ক ও তুমুল বাক-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বৈঠক সমাপ্ত এবং অস্ত্র-বিরতি ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত;

- ১৯–২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ : উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির এক প্রতিনিধিদলের খাগড়াছড়ি জেলার পাঁচটি থানা সফর;
- ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৩ : বিশেষ মহলের ছত্রছায়ায় উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক নানিয়ারচরে পরিকল্পিত গণহত্যার সংঘটন, যাতে ৩০ জন পাহাড়ি নিহত, ১৬০ জন আহত হয়। উপরন্তু ২ জনকে আটক ও ৩০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়;
- ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৩ : সরকার এবং JSS-এর মধ্যে কোনো ধরনের মৌলিক অগ্রগতি ছাড়াই ষষ্ঠ বৈঠক সমাপ্ত এবং ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত অস্ত্র-বিরতি বর্ধিত ;
- ১৬ জানুয়ারি, ১৯৯৪ : শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমাসহ ভারতীয় কর্মকর্তাদের রামগড় সফর। রামগড় রেস্ট হাউজে শরণার্থী প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত ও শরণার্থী নেতাদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত;
- ২২ জানুয়ারি, ১৯৯৪ : শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা কর্তৃক ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ৪০৫টি শরণার্থী পরিবারের প্রত্যাবর্তনের কথা ঘোষণা;
- ২১ এপ্রিল, ১৯৯৪ : যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের আমন্ত্রণক্রমে শরণার্থী পুনর্বাসন কার্যক্রম স্বচক্ষে দেখার জন্য ত্রিপুরার গভর্নর রমেশ ভাণ্ডারীর খাগড়াছড়ি সফর;
- ২৫ এপ্রিল, ১৯৯৪ : উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে একটি শরণার্থী প্রতিনিধিদলের পুনর্বাসন কাজ স্বচক্ষে দেখার জন্য খাগড়াছড়ি সফর;
- ৫ মে, ১৯৯৪ : সরকারি কমিটি এবং JSS-এর মধ্যে কোনো প্রকার মৌলিক অগ্রগতি ছাড়াই সর্বশেষ সপ্তম দফা বৈঠক সমাপ্ত এবং ১৫ জুলাই পর্যন্ত অস্ত্র-বিরতি বর্ধিত। একটি সাব-কমিটি গঠন।
- ৪ জুন, ১৯৯৪ : সরকারি সাব-কমিটি এবং JSS নেতাদের মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত;
- ১ জুলাই, ১৯৯৪ : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি সাব-কমিটির সাথে শরণার্থী কল্যাণ কমিটির এক আলোচনা বৈঠক রামগড় রেস্ট হাউজে অনুষ্ঠিত;
- ১০ জুলাই, ১৯৯৪ : সরকারি সাব-কমিটির সাথে JSS-এর দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত ;
- ২৮ আগস্ট, ১৯৯৪ : সরকারি সাব-কমিটির সাথে JSS-এর তৃতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত ;
- ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ : সরকারি সাব-কমিটি এবং JSS-এর মধ্যে চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত ; বৈঠকে উভয় পক্ষের মধ্যে ৪টি বিষয়ে ঐকমত্য এবং ৩১ মার্চ, ১৯৯৫ পর্যন্ত অস্ত্র-বিরতি বর্ধিত;

- ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ : উপেন্দ্রলাল চাকমা ও উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মকর্তাদের পুনর্বাসন কাজ দেখতে খাগড়াছড়ি সফর ;
- ১৫ মার্চ, ১৯৯৫ : পূর্ব-নির্ধারিত পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পার্বত্য গণপরিষদের হরতাল আহ্বান ও ছাত্র পরিষদের মিছিলে হামলা– ২৮ জন পাহাড়ি ছাত্র আহত, ৪ জন নিখোঁজ, ২২ জন আটক ও ২৪৭টি ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ;
- ১৭ মার্চ, ১৯৯৫ : ত্রিপুরার ঠাকুরবাড়ি শিবিরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে 'সরকার তাদের দাবি পুরোপুরি না মানলে তারা ফিরবেন না' বলে উপেন্দ্রলাল চাকমার ঘোষণা।
- ৪ অক্টোবর ১৯৯৫ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব রবিন র‍্যাফেল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।
- ২৫ অক্টোবর ১৯৯৫ : শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের বৈঠক হয়। খালেদা জিয়ার শাসন আমলে এ নিয়ে কোন চূড়ান্ত ফলাফল ছাড়া তেরটি বৈঠক হয়।
- ১৬ নভেম্বর ১৯৯৫ : খাগড়াছড়িতে এক জনসভায় খালেদা জিয়া শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানান।
- ২৪ জুন ১৯৯৬ : শান্তিবাহিনীর ৮ জন সদস্য আত্মসমর্পন করেন।
- ১১ জুন ১৯৯৬ : হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী কল্পনা চাকমা রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হন।
- ১৬ জুলাই ১৯৯৬ : শান্তিবাহিনীর ৬ দফা চুক্তির বিরুদ্ধে PPSPC ১৪ দফা দাবি পেশ করে।
- ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ : শান্তিবাহিনীর ৪ জন সদস্য আত্মসমর্পন করে।
- ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ : সদ্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করে।
- ২১-২৪ জুন, ১৯৯৬ : খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে এই কমিটির সঙ্গে JSS এর বৈঠক হয়।
- ২৫-২৭ জানুয়ারি ১৯৯৭ : ঢাকায় দ্বিতীয় বৈঠক।
- ১২-১৩ মার্চ ১৯৯৭ : রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পুনরায় বৈঠক হয়।
  এই বৈঠকের পর ২৮ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিলের মধ্যে ৬,৮০৮ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে।
- ১১-১৪ মে ১৯৯৭ : পদ্মায় চতুর্থ বৈঠকের উভয়পক্ষ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হয়।
- ৮ এপ্রিল ১৯৯৭ : কল্পরঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।
- ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ : সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।